মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকার

গাজী শামছুর রহমান

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট

মানবাধিকার
এবং
মৌলিক অধিকার

গাজী শামছুর রহমান

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট

www.pathagar.com

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকার

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৪০১
নবেম্বর ১৯৯৪

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট

মুদ্রণ
পিআইবি প্রেস
৩ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ ঃ মোমিন উদ্দিন খালেদ

MANABADHIKAR EBONG MAULIK ADHIKAR

AGRAHAYAN 1401
NOVEMBER 1994

Price : Tk. 25.00
মূল্য ঃ ২৫.০০

www.pathagar.com

ভূমিকা

গাজী শামছুর রহমান আইনের আকাশে গ্রহ নন, আমার বিবেচনায় নক্ষত্র। অর্থাৎ অন্যের আলোকে তিনি উজ্জ্বল নন, আপন দীপ্তিতে ভাস্বর। জটিল আইনের ত্রিংশ সহস্রাধিক মুদ্রিত পৃষ্ঠা রচনার বিরল ক্ষমতার এই অনন্য প্রতিভা প্রেস ইনস্টিটিউটকে সম্মানিত করেছে তাঁর রচনাসম্ভারের একটি ক্ষুদ্রাংশ দ্বারা। এটা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর চতুর্থ পুস্তক।

জাতিসংঘ ঘোষণা করেছে ১৯৪৮-এ মানবাধিকার, আর তারই আদলে বাংলাদেশ ঘোষণা করেছে মৌলিক অধিকার ১৯৭২-এ।

মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকার সংজ্ঞায়নে, সংরক্ষণে ও বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী। যে প্রত্যয়গুলো এই অধিকারদ্বয়ের মূল ধারক ও বাহক, সেগুলো হৃদয়ে প্রোথিত এবং গ্রথিত হলে তবেই এই কাজে অগ্রসর হওয়া অর্থবহ হয়। এই বইটি ঐ প্রত্যয়যুক্ত হৃদয়ে সঞ্চালনে সহায়ক হবে, আমার বিশ্বাস।

অগ্রহায়ন, ১৪০১
নবেম্বর, ১৯৯৪

ডঃ মোহাম্মদ তৌহিদুল আনোয়ার
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মানবাধিকার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রত্যেকের জানা থাকা উচিত তার অধিকারের পরিচয়, পরিমাণ ও পরিধি। সাংবাদিকদের জন্য এই জ্ঞান একান্তই অপরিহার্য।

সকল কালের, সকল দেশের, সকল মানুষের ন্যূনতম যে অধিকারগুচ্ছ সর্বজনস্বীকৃত, তারই নাম মানবাধিকার। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ ও জারি করে। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে এই মানবাধিকারগুচ্ছ মৌলিক অধিকার নামে চিহ্নিত হয়েছে।

অধিকারগুলির মূল পাঠ, আমার ভাষ্যসহ পরিবেশিত হল ঃ

প্রস্তাবনা

*যেহেতু, মানব–পরিবারের (**human family**) সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা ও সম এবং অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতি হইতেছে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি;*

যেহেতু মানবিক অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা ও অবমাননার ফলে এমন সব বর্বরোচিত ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হইয়াছে, যেগুলি মনুষ্যজাতির বিবেককে দারুণভাবে আঘাত করিয়াছে এবং সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ আশা–আকাঙ্খা হিসাবে এমন এক জগতের আগমন বার্তা ঘোষণা করা হইয়াছে যেখানে সকল মানুষ বাক–স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ভয় ও অভাব হইতে মুক্তি ভোগ করিবে;

যেহেতু, অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষকে যাহাতে সর্বশেষ উপায় হিসাবে বিদ্রোহের আশ্রয় গ্রহণ করিতে না হয় সেইজন্য আইনের অনুশাসন দ্বারা মানবিক অধিকার রক্ষা করা অপরিহার্য;

যেহেতু, জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্কের উন্নতিবিধানের জন্য ইহা অবশ্যই প্রয়োজন;

যেহেতু, জাতিসংঘের জনগোষ্ঠীসমূহ সনদের মাধ্যমে মৌল মানবিক অধিকার, মানব ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ও মূল্য এবং নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাসের কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছে এবং বৃহত্তর মুক্ত পরিবেশে সামাজিক অগ্রগতি এবং জীবনের মানের উন্নতি সাধন করিতে সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে;

যেহেতু, সদস্য–রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘের সহযোগিতায় মানবিক অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সার্বজনীন শ্রদ্ধা ও উহাদের প্রতিপালন–এর উন্নতি বর্ধন করিতে নিজেরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ;

যেহেতু, এই প্রতিশ্রুতির পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য ঐসব অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে একটা সাধারণ সমঝোতার অতীব প্রয়োজন; অতএব এখন–

সাধারণ পরিষদ

মানবিক অধিকারের এই সার্বজনীন ঘোষণাকে সকল জনগোষ্ঠীর এবং সকল জাতির জন্য অভীষ্ট সাধারণ মান হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার করিতেছে, যাহাতে সমাজের

www.pathagar.com

প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিটি অংশ এই ঘোষণাকে সর্বদা মনে রাখিয়া অধ্যাপনা ও শিক্ষার মাধ্যমে এইসব অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান বৃদ্ধি করিতে কঠোরভাবে চেষ্টা করে, এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল কর্মব্যবস্থার মাধ্যমে সদস্য–রাষ্ট্রগুলির জনগোষ্ঠীসমূহ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনাধীন ভূখন্ডের জনগণের মধ্যে এইসব অধিকার ও স্বাধীনতার সার্বজনীন ও কার্যকরী স্বীকৃতি ও প্রতিপালন নিশ্চিত করিতে প্রয়াস পায়।

অনুচ্ছেদঃ ১

সকল মানুষ স্বাধীন প্রাণীরূপে এবং সমমর্যাদা ও সমান অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহারা বিচারবুদ্ধি(reason) ও বিবেকের অধিকারী এবং তাহাদের উচিত ভ্রাতৃত্বের মনোভাব লইয়া পরস্পরের সহিত আচরণ করা।

ভাষ্য

এই অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য দুটিঃ এক, সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং অধিকার ও মর্যাদায় সমান। দুই, সকল মানুষই বিবেক ও যুক্তিসম্পন্ন।

প্রথম বক্তব্যটি বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। মধ্যযুগীয় সমাজে এই ধারণাটি অস্বীকৃত ছিল। সকল মানুষই যে স্বাধীন এ ধারণা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে যুগে উচ্চারিত হলেও বাস্তবায়নের পথে কোন প্রয়াস তখন দেখা যায়নি। বরং উচ্চতর শক্তির নির্দেশ মেনে চলাই ছিল সেদিনের স্বীকৃত কর্তব্য। এই উচ্চতর শক্তির মধ্যে প্রধান ছিল ধর্ম। ধর্মের মধ্যে দু'টি ভাগ। এক, পুঁথিকেতাব এবং দুই, এদের ভাষ্যকার। পুঁথির মধ্যে পড়ে বেদ, বাইবেল প্রভৃতি এবং ভাষ্যকারদের মধ্যে পড়ে অবতার, ঈশ্বরপুত্র প্রভৃতি। অন্য নিরীখে ধর্মকে আরো দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ আধ্যাত্মিক এবং ইহলৌকিক। আধ্যাত্মিক ভাগে পড়ে প্রার্থনা, পূজা এবং নামাজ আর ইহলৌকিক ভাগে পড়ে হিন্দু, খ্রীষ্টান এবং ইসলামী আইন। প্রথম ভাগ সম্পর্কে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিষয়ে মানবাধিকারের প্রবক্তাগণ কোন বিরূপ বাক্য উচ্চারণ করেননি; বরং এ বিষয়ে সকলের নিরংকুশ অধিকার স্বীকার করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রবক্তাবৃন্দ বলেন যে, প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন এই অর্থে যে তারা এই ক্ষেত্রেও যুক্তি প্রয়োগ করতে পারবেন। ধর্মে নিশ্চয়ই যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু সেখানে যুক্তি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসের অধীন। বেদ, বাইবেল প্রভৃতিতে যে নির্দেশাবলী আছে সেগুলি দুর্বল মানুষের বিচারের আয়ত্তের বাইরে। সেগুলো ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু অবমাননা করা যায় না।

উচ্চতর শক্তির দ্বিতীয়টি হচ্ছে একতান্ত্রিকতা। এর অন্য নাম ফ্যাসীজম, কমিউনিজম বা উগ্র জাতীয়তাবাদ। এই আদর্শের সারকথা হচ্ছে জাতির বা সমাজের বা দেশের সামগ্রিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তির বিবেক–বুদ্ধি বিসর্জন। রুশো বলেছিলেন, ব্যক্তির জীবন আসলে সমষ্টির দান। সুতরাং গোষ্ঠীনির্দেশ দিলে ব্যক্তি নির্বিচারে নির্দেশ পালন করতে বাধ্য।

মানবাধিকারের প্রবক্তাবৃন্দ বলেন যে, মানুষ এই উচ্চতর শক্তিগুলোর অধীন নয়। তাদের দৃষ্টিতে প্রতিটি ব্যক্তি অনন্য এবং অধিকারে ও মর্যাদায় সকলেই তুল্যমূল্য। প্রতিটি ব্যক্তির বিকাশের ফলে সমগ্র মানবজাতির জীবন সমৃদ্ধতর হয়। দেশের জন্য, সমাজের জন্য, জাতির

www.pathagar.com

জন্য মানুষ নয়, বরং মানুষের জন্য দেশ, সমাজ এবং জাতি সকলই। মানুষ উপায় নয়, লক্ষ্য।

এটি পূর্ণ সত্য নয় যে, দবির বাংলাদেশী পুরুষ মুসলমান ডাক্তার। তার সম্যক পরিচয় এই যে, সে মানুষ। বাঙ্লাদেশের নামে, পুরুষত্বের নামে, ইসলামের নামে বা ডাক্তারীর জন্যে সে তার সম্যক পরিচয়কে খর্বিত হতে দিতে পারে না।

এবার আসি মানবাধিকারের ঘোষণার দ্বিতীয় বক্তব্যের আলোচনায়। মানবাধিকারের প্রবক্তাগণের মতে, প্রত্যেক মানুষ বিবেক ও যুক্তিসম্পন্ন; তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুক্তি ও বিবেকের প্রয়োগেই তার সার্থকতা। অভিযোগ করা হয় যে, ধর্ম এবং অন্যান্য উচ্চতর শক্তির নির্দেশ যদি নির্ভরযোগ্য না হয় তবে উচিত-অনুচিত নির্ণয় হবে কিভাবে? হালাল-হারাম, জায়েজ-না জায়েজ, কর্তব্য-অকর্তব্য এগুলো নির্ধারণের মানদন্ড তাহলে কি? এর উত্তরে মানবাধিকারের প্রবক্তাগণ বলেন, বিচিত্র এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার জগতে যুক্তির মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য নীতি বা মানদন্ডের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তারই উপরে আইন কানুন ও ঔচিত্য অনুচিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। তবে তারা এ প্রসঙ্গে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন যে, এইভাবে আবিষ্কৃত নীতি চরম বা সনাতন নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এসব ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। মানবাধিকারবাদী ব্যবস্থায় কোন একটি মতবাদ বা বিধানকে শাশ্বত এবং সনাতন জ্ঞান করা হয় না; বরং বলা হয় যে, চিন্তার পূর্ণ স্বাধীনতা সকল মানুষের থাকা উচিত। তারা তিনটি কারণে যুক্তিশীলতার স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। প্রত্যেক ব্যক্তি যেকোন মতবাদ পোষণ করতে পারেন; কিন্তু তার মত যে অভ্রান্ত এমন দাবী করতে পারেন না- বিপরীত মতের মধ্যেও সত্য থাকা সম্ভব। সুতরাং সেই মতকে দমন করা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক মানুষের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ এবং সেকারণে তার সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণ। বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সংঘর্ষে বৃহত্তর সত্য উদঘাটিত হবার পথ খুঁজে পায়। তৃতীয়তঃ কোন সিদ্ধান্ত যদি সত্যও হয়, তবে সমালোচনার অভাবে সত্য একদিন সংস্কার হয়ে যায়।

মানবাধিকারের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, মানুষ মৌমাছি বা বাবুই পাখি নয়। মৌমাছির চাক এবং বাবুই পাখির বাসা অসাধারণ কুশলী শক্তির পরিচয় বহন করে কিন্তু সেই স্থাপত্য এক চুলও অগ্রসর হয়নি, তাদের সমাজে এফ. আর খান জন্মেনি। প্রাণীকুল পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর মানুষ পরিবেশ বদলাতে পারে। সৃষ্টির সামর্থ্যে মানুষ জীব জগতে অনন্য। এই সামর্থ্যের পূর্ণ বিকাশ মানবাধিকার ঘোষণার মূল আকাংক্ষা ও প্রত্যাশা। এই বিকাশ ব্যক্তিকে বিলোপ করে সম্ভব নয়; কারণ এই বিকাশের জন্য যে সাধনা প্রয়োজন তা করতে পারে ব্যক্তিই।

দেশ থাকবে, সমাজ থাকবে, ধর্ম থাকবে কিন্তু সেখানে থাকবে স্বতঃসিদ্ধভাবে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য। জ্ঞানের বিকাশ ছাড়া ব্যক্তির বিকাশ হতে পারে না এবং জ্ঞানের উৎস হল জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসাই মানুষকে উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাবে। যেখানে জিজ্ঞাসার অধিকার নেই সেখানে সৃষ্টির প্রেরণা দলিত।

অনুচ্ছেদঃ ২

জাত (race), বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক কিংবা অন্য কোন প্রকার মতাদর্শ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি অথবা অন্য কোন মর্যাদার ভিত্তিতে

www.pathagar.com

কোনরূপ ভেদাভেদ ব্যতীত, প্রত্যেকেই এই ঘোষণায় উল্লিখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী।

তাহা ছাড়া কোন ব্যক্তির দেশ বা ভূখন্ডের রাজনৈতিক, এখতিয়ারমূলক অথবা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন ভেদাভেদ করা চলিবে না, সেই দেশ বা ভূখন্ড স্বাধীন হউক, অছিভুক্ত হউক, অস্বায়ত্তশাসিত হউক, অথবা অন্য কোন প্রকারের সীমিত সার্বভৌমত্বের অধীনই হউক।

ভাষ্য

মানবাধিকার ঘোষণার প্রথম অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য দু'টি ঃ (১) জন্মগতভাবে মানুষ স্বাধীন এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন এবং (২) তারা বিবেক ও বুদ্ধিসম্পন্ন। এই বক্তব্য দুটি সকল মানবাধিকারের মূল ভিত্তি। যেহেতু জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন সেহেতু স্বাধীনতা ও সমতা তাদের সহজাত ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার। দ্বিতীয়তঃ যেহেতু মানুষ যুক্তি ও বিবেক নিয়ে জন্মেছে সেহেতু তারা যেসব প্রাণীর এই গুণগুলি নেই সেইসব প্রাণী থেকে পৃথক; সেই কারণে এই অধিকারগুলিও তাদের সহজাত এবং অবিচ্ছেদ্য।

মানবাধিকার ঘোষণার ৩ থেকে ২১ অনুচ্ছেদে সকল মানুষের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এই অধিকারসমূহের মধ্যে আছে জীবনের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, দাসত্বহীনতা, অবমাননাকর শাস্তি থেকে নিরাপত্তা, আইনের সমক্ষে সমতা, বিচার, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, জাতীয়তা, বিবাহ, সম্পত্তি, বাক-স্বাধীনতা, সমাবেশ, সরকারে অংশগ্রহণ এবং সরকারী চাকরিতে প্রবেশের অধিকার।

মানবাধিকার ঘোষণার ২২ থেকে ২৭ অনুচ্ছেদে ঘোষিত হয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার। শেষ ৩টি অনুচ্ছেদে আছে মানবাধিকারের পূর্ণতা ও সীমায়নের অধিকার।

এই যে অধিকারগুলোর কথা বলা হল, এগুলোর ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য করা যাবে না, সেই ঘোষণাই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদে এই বৈষম্যহীনতার নীতি গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে ৫টি কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধ। সেগুলো হচ্ছে, (১) ধর্ম, (২) গোষ্ঠী, (৩) বর্ণ, (৪) নারী-পুরুষ ভেদ এবং (৫) জন্মস্থান। মানবাধিকার ঘোষণার এই অনুচ্ছেদে এ পাঁচটি তো আছেই এবং আছে আরো পাঁচটি। সেগুলো হচ্ছে (১) ভাষা, (২) রাজনৈতিক বা অন্যকোন মতবাদ, (৩) জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি (৪) সম্পত্তি এবং (৫) অন্য মর্যাদা। এই অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে যে, স্বাধীন দেশের মানুষ নয়, এমন ব্যক্তিও এই বৈষম্যহীনতার অধিকার পাবেন।

বৈষম্যহীনতা বলতে অধিকার বন্টন ও সীমায়নের ব্যাপারে একজনের সঙ্গে একরকম আর অন্যজনের সঙ্গে অন্যরকম না করাকে বুঝায়। অধিকার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, তা সে আইনের দ্বারাই হোক আর নির্বাহী নির্দেশের দ্বারাই হোক, মানুষের মধ্যে বৈষম্য নিষিদ্ধ।

ধর্মের কারণে পৃথিবীতে বৈষম্যের শিকার বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসেও অনিঃশেষিত। ইসরাইল, নেপাল, পাকিস্তান প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। সেই সব দেশে রাষ্ট্রধর্ম বহির্ভূত ব্যক্তিদের উপর বৈষম্য প্রদর্শন অস্বাভাবিক নয়। শুধুমাত্র ধর্মবিশ্বাসের কারণে এক সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

মানুষ কর্তৃক অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ লাঞ্ছিত হওয়ার উদাহরণও বিরল নয়। অভিযোগ করা হয়, আলজিরিয়ার মৌলবাদীগণ এবং পাকিস্তানে কাদিয়ানীগণ বৈষম্যের শিকার। গোষ্ঠী ও বর্ণের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা রক্তাক্ত। লিঙ্গভেদের বৈষম্য প্রশমনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও এই বৈষম্য অপ্রকট নয়। জন্মের কারণে অর্থাৎ একটি বিশেষ স্থানে জন্ম হওয়ার কারণে, একটি বিশেষ গোত্র বা পরিবারে জন্ম হওয়ার কারণে, একটি বিশেষ সমাজে জন্ম হওয়ার কারণে বৈষম্য আজো জগৎজোড়া। এই সব বৈষম্যের বিরুদ্ধে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা সোচ্চার এবং উচ্চকণ্ঠ।

বৈষম্য এবং পার্থক্য এক নয়। মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে এবং সে পার্থক্য এসেছে প্রকৃতি থেকে। প্রকৃতিদত্ত সে পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। নারী ও পুরুষ সমান কিন্তু অভিন্ন নয় (equal but not identical)। শিশু এবং যুবক অধিকারে সমান কিন্তু শক্তিতে ভিন্ন। বার্টান্ড রাসেল এবং গোবিন্দ চন্দ্র দেব উভয়ই দার্শনিক; কিন্তু তাদের স্তরভেদ আছে। এই স্তরভেদের স্বীকৃতি বৈষম্য নয়।

মানুষ মানুষই। স্বাধীন দেশের মানুষের সাথে পরাধীন দেশের মানুষের কোন তফাৎ নেই। কোন্ স্থানে মানুষ জন্মাবে তার উপরে মানুষের হাত নেই। বাংলাদেশের মত স্বাধীন দেশে, হংকং-এর মত বৃটিশ উপনিবেশে কিংবা ইসরাইল অধিকৃত গাজায় যারা জন্মগ্রহণ করছে তারা নিজের ইচ্ছায় ঐসব দেশে জন্মায় নি। ঐসব স্থানে জন্মগ্রহণের জন্য তাদের কোন বৈষম্যের শিকার হওয়া উচিত নয়। ঐসব স্থানে জন্মের কারণে বৈষম্যের শিকার হওয়ার মত কোন অপরাধ তারা করেনি। পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের স্রষ্টা এক ও অভিন্ন। তাই কোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বৈষম্য স্রষ্টার সৃষ্টির মর্যাদার প্রতি অবমাননা করা হয়।

পরাধীন দেশে যাদের জন্ম, পরাধীনতার কারণেই সেখানকার মানুষ মানবাধিকার ভোগ করতে পারে না। মানবাধিকারের এই ঘোষণা পরাধীন দেশের পরাধীন মানুষের এই কলংককে ধিক্কার দেয়।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার এই অনুচ্ছেদে যে বৈষম্যহীনতার অধিকার ঘোষিত হয়েছে তা বিশ্বের প্রায় সকল দেশের লিখিত সংবিধানে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং বৈষম্যহীনতা যেমন একটি মানবাধিকার তেমনি সংবিধানে ঘোষিত মৌলিক অধিকারও বটে।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা যেহেতু বিশ্বের প্রায় সকল দেশ অনুমোদন করেছে তাই দাবী করা যায় এই ঘোষণাগুলি আন্তর্জাতিক আইনের সূত্ররূপ আবশ্যিকভাবে গৃহীত ও প্রতিপালিত হবে। তবুও মানবাধিকারের সাথে মৌলিক অধিকারের পার্থক্য থেকেই যায়। মৌলিক অধিকার ভঙ্গ হলে আইনের আশ্রয় নেয়া যায়, কিন্তু মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার যেগুলো দেশের মৌলিক অধিকারের সদৃশ বা তুল্য নয়, সেগুলো ভঙ্গ হলে আইনের আশ্রয় দুর্লভ।

অনুচ্ছেদঃ ৩

প্রত্যেকের জীবন, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রহিয়াছে।

www.pathagar.com

কবি বলেছেন, "মানব জীবন সার/এমন পাবে না আর।" ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মানুষকে বলা হয়েছে সৃষ্টির সেরা জীব–'আশরাফুল মাখলুকাত'। সনাতন ধর্মে মানুষকে বলা হয়েছে, 'নরনারায়ণ'। নিঃসন্দেহে মানুষের জীবন একটি অমূল্য ধন। জীবনের অধিকার তাই একটি মূল্যবান মানবাধিকার।

মাতৃগর্ভে স্থিতি থেকে শুরু করে জীবনের শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত সময়কে মানুষের জীবনকাল বলা যায়। এই সময়ের জন্য মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের নামই জীবনের অধিকার। প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে কোন ব্যক্তি দ্বারা আহত বা নিহত না হবার। অধিকার আছে স্বাভাবিকভাবে জীবন বিপন্নকারী কোনকিছুর ভয়ে সন্ত্রস্ত না থাকার। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে এই অধিকারকে মৌলিক ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের দন্ডবিধিতে কি কি পরিস্থিতিতে বা কোন কোন অবস্থায় মানুষের জীবনের উপর আঘাত করা যায় তার কথা বলা হয়েছে। খুন, রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং নরহত্যার সাথে ডাকাতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে বাংলাদেশের মানুষের জীবন হরণ করা যায়।

দ্বিতীয় যে অধিকারটি একইভাবে মূল্যবান সেটি হচ্ছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা শব্দটির অর্থ ব্যাপক। প্রথমতঃ স্বাধীন ব্যক্তি অর্থ স্বাধীন দেশের মানুষ। যে ব্যক্তি স্বাধীন দেশের অধিবাসী নয় সে আপন দেশে পরবাসী। পরের ইচ্ছায় তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বাধীন দেশের মানুষ হলেই যে সে স্বাধীন হবে এমন গ্যারান্টিও নেই। সুতরাং দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতার অর্থ শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নয়, অন্য সকল প্রকার অধীনতা থেকে মুক্তি। এই অধীনতাগুলি নানা প্রকারের হতে পারেঃ

(ক) অর্থনৈতিক অধীনতা এমন একটি বন্ধন যা মানুষকে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণে নির্মমভাবে বঞ্চিত করে। পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশ উন্নত দেশের অর্থবিষয়ক নির্দেশে কাজ করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া দেশের দরিদ্র নিরন্ন মানুষ আর্থিক দীনতার কারণে স্বাধীন জীবনের স্বাদ পায় না।

(খ) সামাজিক অধীনতাঃ সমাজের এমন অনেক অবস্থা বা আদেশ–নিষেধ থাকতে পারে যেগুলোর উৎস হয়তো কল্যাণকর কিন্তু বর্তমানে সেগুলো অন্ধসংস্কার। এই অন্ধ– সংস্কারের অধীনতাও একটি বড় অভিশাপ। যারা এর বশ্য তারা স্বাধীনতার স্বাদ পায় না।

(গ) সাংস্কৃতিক অধীনতাঃ তথাকথিত উন্নততর সভ্যতার আগ্রাসনে অনেক লোকজ ঐতিহ্য আজ দেশে দেশে অপসৃয়মান। যে দেশের যা সংস্কৃতি সে দেশের মানুষ অন্য সংস্কৃতির অধীন হলে তার স্বকীয়তা ক্ষুণ্ন হয়।

সবশেষে এই প্রসঙ্গে যেটি আলোচ্য সেটি হচ্ছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার। যে মানুষ স্বাধীন, রাষ্ট্রীয়ভাবে, আর্থিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং সাংস্কৃতিকভাবে সে মানুষের স্বাধীনতা মরীচিকা হয়ে যায় যদি তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা না থাকে।

নিজের ঘরে, রাস্তাঘাটে, শিক্ষায়তনে, কর্মস্থলে, বিশ্রাম বা বিনোদনের আগারে নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এসব স্থানে নিরাপত্তা না থাকলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। বাংলাদেশের সংবিধানে এই অধিকারের অপ্রত্যক্ষ ঘোষণা আছে। জীবনের অধিকার বলতে

www.pathagar.com

সেখানে নিরাপত্তার অধিকারও বুঝানো হয়েছে। বাংলাদেশের আইনেও মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশের দন্ডবিধিতে মানবদেহে আঘাতকারীকে শাস্তি দেওয়ার বিধান রয়েছে।

অনুচ্ছেদঃ ৪

কোন ব্যক্তিকে ক্রীতদাসত্বে অথবা গোলামিতে আবদ্ধ রাখা যাইবে না; এবং সকল প্রকার ক্রীতদাস-প্রথা এবং দাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধ।

ভাষ্য

দাসপ্রথা মানবতার কলংক। ইসলাম বলে, সকল মানুষই আল্লাহর খলিফা। সনাতন ধর্মে বলা হয়েছে, সবং খল্বিদং ব্রহ্ম। যিশু বলেন, তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতই ভালবাস। এসব কথার সারমর্ম এই যে, মানুষকে প্রভু এবং দাস এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা একান্তই অন্যায়। তবুও বিশ্বের দেশে দেশে এই অন্যায় প্রথা একদিন প্রবলভাবে বিরাজমান ছিল। বলা হয়, মিশরের পিরামিড এবং রোমান সভ্যতা দাসশ্রমের ফসল। সুখের কথা, চিহ্নিত রূপে, স্বীকৃত রূপে বা আইনসম্মত রূপে বিশ্বের কোথাও আজ আর দাস প্রথা নেই।

আইনের চোখে না থাকলেও বস্তুতঃ নানা আকারে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দাস-প্রথা আজো পৃথিবীতে টিকে আছে। এবং সেই কারণেই মানবাধিকারের ঘোষণার একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, 'দাসত্ব-প্রথা নিষিদ্ধ করা হলো'।

সারা জীবনের জন্য বা বংশপরম্পরায় যে মানুষ বা মনুষ্যশ্রেণী অন্যের গোলামি করে তারা ক্রীতদাস। নিয়ম শৃঙ্খলাহীনভাবে ক্রমাগত অন্যের ন্যায়-অন্যায়, আদেশ-নির্দেশ পালন করতে যারা বাধ্য হয় তারাও গোলাম বা ক্রীতদাস।

বাংলাদেশে তো বটেই পৃথিবীর অনেক দরিদ্র দেশে অর্থের বিনিময়ে পুত্র-কন্যা বিক্রয়ের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ থেকে দারিদ্রপীড়িত অসহায় শিশু ও নারী অনেক লোভী আদম ব্যাপারীর মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়ে অবশেষে ধনী পরিবারে বিক্রিত হয়ে যায়। নামে না হলেও আসলে এরা দাস-দাসী।

ধর্মগতভাবেও কোন কোন স্থানে এক শ্রেণীর মানুষকে এমন নিম্নশ্রেণীর বলে চিহ্নিত করা হয় যাদের একমাত্র কর্তব্য উচ্চবর্ণের মানুষদের সেবা করা। এই বিবেকহীন বর্ণাশ্রম প্রথা বিলুপ্তির পথে হলেও এখনো অপসারিত হয়নি।

একদিন ছিল যখন যুদ্ধবন্দীদের দাসরূপে গণ্য করা হতো। বিখ্যাত উপন্যাস এবং ছবি 'Roots'-এ স্পষ্টভাবে ইতিহাসের এক কলংকজনক অধ্যায় উদঘাটন করে দেখিয়েছে যে, এক যুগে শ্বেতকায় মানুষেরা কৃষ্ণকায় মানুষদের জোর করে ধরে নিয়ে জাহাজে ভরতো এবং সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিজ দেশে এনে দাস বানাতো। ইউরোপের আদি ইতিহাসে হাটে-বাজারে দাসদাসী কেনাবেচা হতো।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র মানবিক মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে এবং মানুষ সেই মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলেছে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদঃ ৫

কোন ব্যক্তিকে পীড়ন অথবা নিষ্ঠুর বা অমানুষিক বা অপমানজনক আচরণ অথবা শাস্তির শিকার করা যাইবে না।

ভাষ্য

সারা সভ্য-বিশ্ব একটি প্রত্যয়কে স্বতঃসিদ্ধরূপে মেনে নিয়েছে, সেটি হচ্ছে এই যে, মানুষ আসলে ভাল। এই সত্য স্বীকৃত হলেও যে দৃশ্য বাস্তবে প্রতীয়মান তাতে অসৎ মানুষের সংখ্যা কম নয়। এই পরিস্থিতিতে বলা হয় যে, আসলে মানুষ ভাল হলেও পরিবেশের কারণে ও পরিস্থিতির মোকাবেলায় খারাপ হয়ে যায়। এই খারাপ হয়ে যাওয়াটা একটি ব্যাধি। এই ব্যাধিকে উৎপাটন করতে হলে পরিবেশ এবং পরিস্থিতি উন্নত করতে হয়। উদরাময় থেকে মানুষকে বাঁচাতে বিশুদ্ধ পানি যেমন প্রয়োজন, মন্দ ও অসৎ মানুষকে সৎ করতে হলে তাই সততা নষ্টকারী পরিবেশ ও পরিস্থিতির মূল্যোৎপাটন প্রয়োজন।

এতসব বলার পরেও অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, কিছু মানুষ সহজে ভাল হবার নয়। এই সব মানুষের উপর প্রয়োগের জন্য একটি প্রবচন বাংলাদেশে বহুল প্রচলিতঃ সোজা আঙ্গুলে ঘি বের হয় না। অতএব কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীকে শাস্তি দিতেই হয়; নইলে সমাজ রক্ষা করা যায় না। শাস্তি হচ্ছে একটি ব্যতিক্রমী বিধান এবং ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ।

যেহেতু শাস্তি একটি ব্যতিক্রমী বিধান সেহেতু স্বভাবতঃই এই দাবী করা যায় যে, প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটি মমতাহীন হবে না।

পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়- এই প্রবচনটি বহু পুরাতন। সুতরাং পাপীর সাথে আচরণে কোনরকম নিষ্ঠুরতা বাঞ্ছনীয় নয়। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্মমতা তাই অমানবিক। শাস্তিকে তাই হতে হবে অনিষ্ঠুর ও মানবিক।

সন্তান অবাধ্য হলে ক্ষেত্রবিশেষে মাতা তাকে দৈহিক শাস্তি দিতে পারেন; কিন্তু সব সময়ই সে শাস্তির পিছনে থাকে বেদনাভরা অশ্রু। মায়ের প্রহার প্রসঙ্গে কবি বলেন,

'যদি বা প্রহার করে
বিরলে নয়ন ঝরে
মনের সন্তাপ আর কিছুতে না যায়।'

কিছু কিছু মানুষ আছে, পীড়নে যাদের আনন্দ। এরা সমাজের কলংক। পীড়ন অথবা নিষ্ঠুর আচরণের মধ্যে পৈশাচিক আনন্দ লাভের সকল প্রয়াসকে মানবাধিকার নিষিদ্ধ করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

প্রত্যেকের সকল স্থানে আইনের সম্মুখে ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রহিয়াছে।

ভাষ্য

প্রত্যেকেই আইনের সম্মুখে এবং সর্বত্র একজন ব্যক্তি। বাক্যটি ক্ষুদ্র হলেও এর ব্যঞ্জনা

www.pathagar.com

বিশাল। যে মুহূর্তে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, মানুষ আইন দ্বারা স্বীকৃত একজন ব্যক্তি, সেই মুহূর্তে স্বাভাবিকভাবে স্বীকৃতি আসে তার সকল অধিকারের উপর। ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত মানুষ স্বাধীন। যার স্বাধীনতা অস্বীকৃত সে পূর্ণ মানুষ নয়। ব্যক্তি বলতে তাই স্বাধীন মানুষ বুঝায়।

যে মুহূর্তে বলছি যে, মানুষটি ব্যক্তি সেই মুহূর্তে তার মর্যাদার স্বীকৃতি দিচ্ছি। যে বান্দা ও বান্দী যাদের মর্যাদা নেই– আহারে–বিহারে, আয়াসে–আরামে, ভোগে–উপভোগে তারা উচ্চ বর্গীয় হতে পারে কিন্তু তবুও যেহেতু তারা মর্যাদাহীন তাই তারা ব্যক্তি নয়। ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতির অপর নাম মর্যাদার স্বীকৃতি।

মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ হতে পারে, হতে পারে একজন নিয়োগকর্তা এবং আরেকজন নিয়োজিত। কিন্তু তাদের মধ্যের সম্পর্ককে হতে হবে নির্ধারিত, আইনের দ্বারা, বিধির দ্বারা বা প্রথার দ্বারা। আইন, নীতি বা বিধিবহির্ভূত হুকুমবর্দারী দাসত্বেরই শামিল।

কবি বলেনঃ

'শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

কবি ব্যক্তিকে মানুষ হিসেবে এখানে চিহ্নিত করেছেন। মানবাধিকার ঘোষণার মূল কেন্দ্রে আছে ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিকে ঘিরেই সব কিছু আবর্তিত। মানুষের জন্য সবকিছু; কোন কিছুর জন্য মানুষ নয়। ঈশ্বরের জন্য মানুষ নয়, রাষ্ট্রের জন্য মানুষ নয়, দেশের জন্য মানুষ নয়, এমন কি পরিবারের জন্য মানুষ নয়; এগুলো মানবাধিকার ঘোষণার কেন্দ্রীয় প্রত্যয়।

যে ধর্ম রাষ্ট্র, দেশ বা পরিবার মানুষের ব্যক্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে, সেই ধর্ম, রাষ্ট্র, দেশ বা পরিবার টিকে থাকবার দাবী করতে পারে না। ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই এসবের সৃষ্টি এবং ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই এসবকে টিকে থাকতে হবে।

সমগ্র বিশ্বে নানা অজুহাতে আজ মানুষের ব্যক্তিত্ব পদদলিত হচ্ছে। অর্থশক্তি এমনকি মেধাশ্রেষ্ঠত্বের অজুহাতে মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর আঘাত হানা হচ্ছে। এই সকল আঘাতের বিরুদ্ধে মানবাধিকার ঘোষণার এই অনুচ্ছেদ সরব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

আইনের সম্মুখে সকলেই সমান, এবং কোনরূপ ভেদাভেদ ব্যতীত সকলেই সমভাবে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী। এই ঘোষণার পরিপন্থী কোনরূপ ভেদাভেদের বিরুদ্ধে এবং অনুরূপ ভেদাভেদের জন্য উত্তেজিতকরণের বিরুদ্ধে সকলেই সমান সংরক্ষণ লাভের অধিকারী।

ভাষ্য

আইনের শাসন এই অনুচ্ছেদের মূল কথা। আইনের সম্মুখে সকলেই সমান; আইন মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ করে না।

কিন্তু দেখতে হবে আইনটি আইনানুগ কিনা। দবির স্বাধীন, তার অর্থ এই যে, সে কেবল

www.pathagar.com

মাত্র তার নিজের অধীন। যে আইন সে নিজে করবে, বা যে আইনের পেছনে তার সমর্থন বা অনুমোদন আছে, সে আইনই তার কাছে আইনানুগ আইন। তারই নির্বাচিত ব্যক্তি যখন তার জন্য আইন প্রণয়ন করেন তখন সে আইন তারই আইন হয়ে যায়। বিধিবদ্ধ হলেই সব আইন গ্রহণীয় হয় না।

যে আইন দেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সে আইন বাতিল অর্থাৎ সে আইন আইনই নয়। যে আইন মানবাধিকারের পরিপন্থী সেই আইনকে সঙ্গত আইন বলতে বিবেকে বাধে।

কিন্তু আইন ভাল হলেই যে তা সার্থক হয়, এমন নয়। যে আইনের প্রয়োগ পক্ষপাতহীন সে আইনের প্রয়োগই সার্থক। কর্মকর্তার জন্য এক আইন, কর্মচারীর জন্য অন্য আইন যেমন খারাপ, তেমনি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিভেদ করাও খারাপ। চুরি করলে হাত কাটা যদি আইন হয় তাহলে এর জন্য নবী-দুহিতাও রেহাই পায় না।

বিক্ষুব্ধ মানুষ আইনের আশ্রয় পেতে চায়। আইনের আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রে সকল মানুষের অধিকার এক ও অভিন্ন। আইনের সম্মুখে এবং আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষের সম-অধিকারের যে ঘোষণা এই অনুচ্ছেদ দিয়েছে সেখানে বৈষম্যহীনতার দাবী অপ্রতিহত। আইনের সম্মুখে বা আইনের আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য বা বৈষম্যের উস্কানি দেওয়া এই অনুচ্ছেদে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্য যে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ আজো দূর হয়নি। এবং এই ভেদাভেদের সমর্থনকারী কণ্ঠ একেবারে নিরব নয়। নানা অজুহাতে এই ভেদাভেদকে সমর্থন করা হয়। শক্তির অসমতা, অর্থের অসমতা, বিদ্যার অসমতা, জ্ঞানের অসমতা, মেধার অসমতা এইসবের ভিত্তিতে বৈষম্যের দাবী করা হয়। এই অনুচ্ছেদ এ ধরনের দাবীর তীব্র প্রতিবাদ করছে। তবে এখানে একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলতে হয়, 'আইনের সম্মুখে সকলেই সমান' এর অর্থ এই নয় যে, সকলের জন্য সমান আইন। ধনী শিল্পপতিকে আয়কর দিতে হয়, বিত্তহীন কৃষককে দিতে হয় না। আয়কর আইন অসম হলেও মানবাধিকার বহির্ভূত নয়। পুরুষের দেহতল্লাশীতে অন্য কোন পুরুষের উপস্থিতি আবশ্যক নয়; কিন্তু নারীর দেহ-তল্লাশীতে নারী আবশ্যক। এই বৈষম্য দোষাবহ নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

সংবিধান অথবা আইনের দ্বারা প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ লংঘন করা হইলে তাহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত বিচারালয়ের মাধ্যমে ফলপ্রসূ প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রহিয়াছে।

ভাষ্য

কিছু কিছু অধিকার আছে, যেগুলি একান্তই মৌলিক। মৌলিক বলতে মূলের সাথে সংযুক্ত বুঝায়। মনুষ্যত্বই মানবের মূল। মূল ধরে নাড়া দিলে মহীরূহ ভূলুণ্ঠিত হয়। যেসব বিশিষ্টতা নিয়ে মানবজাতি মনুষ্যত্বের দাবী করতে পারে, সেই বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষের মূল। এগুলোকে

www.pathagar.com

খর্ব বা ধ্বংস করার অর্থ মানবের মনুষ্যত্বকে খর্ব বা ধ্বংস করা। জীবনের অধিকার, ভাবপ্রকাশের অধিকার, চলাফেরার অধিকার প্রভৃতি এই অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। এই অধিকারগুলি তাই মৌলিক।

মৌলিক ছাড়াও অন্য অধিকার মানুষের থাকতে পারে। দবির টাকা নিয়েছে সাবেতের কাছ থেকে। দবিরের অধিকার আছে সাবেতের কাছ থেকে টাকা ফেরত পাবার। এই অধিকার মৌলিক নয়, দ্বিপাক্ষিক।

মৌলিক অধিকারগুলির কিছু কিছু আজ পর্যন্ত লিখিত হয়নি। সেগুলি এতই স্বাভাবিক যে, মনুষ্যত্ব থেকে সেগুলি বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মৌলিক অধিকার না বলে এগুলোকে স্বভাবজ অধিকার বলা যায়।

মৌলিক অধিকার বিধৃত থাকে সংবিধানে। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারের বর্ণনা আছে। সংবিধানে বর্ণিত এইসব মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সকল আইন ও কর্মধারা বাতিল বলে গণ্য হয়।

আবার কিছু কিছু মৌলিক অধিকার দেশের সাধারণ আইনে বিধৃত থাকে। ইংল্যান্ডে কোন লিখিত সংবিধান নেই; সেখানে সাধারণ আইনের মধ্যেই মৌলিক অধিকারের বিধান পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের ফৌজদারী কার্যবিধিতে হেবিয়াস কর্পার্সের বিধান আছে।

মৌলিক অধিকার, তা সে যেখানেই থাকুক না কেন, তখনই মূল্য বহন করে যখন তা লংঘনের প্রতিকারের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত এবং অটুট থাকে। আদালতের মাধ্যমে অধিকারভঙ্গের প্রতিকার পাওয়া গেলেই তবে মৌলিক অধিকার সার্থকতা পায়।

কথায় বলে, 'কাজীর গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই'। আইনের মধ্যে ভাল ভাল কথা লেখা আছে, আছে আদর্শের চাকচিক্য, কিন্তু বাস্তবে তার কোন প্রয়োগ নেই; এই অবস্থা সত্যিই শোচনীয়।

এই অনুচ্ছেদ ঘোষণা দিয়েছে মৌলিক অধিকার লংঘনের প্রতিকার পাওয়ার অধিকার সকলের আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

কোন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছামূলকভাবে গ্রেফতার, আটক অথবা নির্বাসন করা যাইবে না।

ভাষ্য

জন্মগতভাবে মানুষ যে স্বাধীন এবং সে কারণে তার যে অধিকার আছে যথেচ্ছ বিহারের, এগুলি মানবাধিকারের মূল কথা। এই ধুলিময় পৃথিবীতে তার জন্ম এবং এর আকাশে-বাতাসে তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এবং সবশেষে এখানেই তার জীবনের সমাপ্তি। তাই মানুষের আশা এই যে, তার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে সে কোন স্বৈরাচারীর স্বেচ্ছাচারমূলক বাধা-নিষেধের অধীন হবে না। প্রত্যেক মানুষের তাই অধিকার আছে গ্রেফতার না হওয়ার, আটক না পড়ার এবং নির্বাসনে না যাবার। অবশ্য আইনে বিধান আছে এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের; আইন ছাড়া কোন ব্যক্তিকে

www.pathagar.com

এইসব ব্যবস্থার শিকারে পরিণত করা যায় না।

শক্তিমানের দ্বারা দুর্বল আটক হয়, হতে পারে, দলীয় কারণে মানুষ গ্রেফতার হতে পারে, তবে এই পরিস্থিতি যাতে না হয়, সে জন্যই মানবাধিকারের এই ঘোষণা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

প্রত্যেক ব্যক্তি, তাঁহার অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত কোন অপরাধমূলক অভিযোগ (criminal charge) —এর ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয় কর্তৃক ন্যায্য ও প্রকাশ্য শুনানি লাভের অধিকারী।

ভাষ্য

মানুষের যেমন অধিকার আছে তেমনি তার কর্তব্যও আছে। দেশের সংবিধান এবং আইন এই অধিকার ও কর্তব্যের সীমা দেয় এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। দেওয়ানী আইন মানুষের অধিকার ও দায়িত্বের পরিধির বিধান দেয় এবং পরিধি অতিক্রান্ত হলে তার প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করে।

ফৌজদারী আইন অপরাধের পরিচয় প্রদান করে এবং সেই পরিচয়ে অপরাধ বলে চিহ্নিত কর্মকান্ডে কেউ লিপ্ত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য অভিযোগ গঠনের প্রক্রিয়া বলে দেয়।

এ দু' টি ক্ষেত্রে অর্থাৎ দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে মানবাধিকারের ঘোষণা এই যে, এগুলির বিচার হবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয়ে এবং ন্যায্য ও প্রকাশ্য শুনানির মাধ্যমে। এবং এই বিচারের ভিত্তি হবে সমতা।

কার কি অধিকার এবং সে অধিকার কতখানি এবং কার কি কর্তব্য এবং সে কর্তব্য কতখানি এই প্রশ্নগুলি নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বিচারালয়ের উপর। একইভাবে অপরাধ নিষ্পন্ন হয়েছে কিনা তাও নির্ধারণের কাজ বিচারালয়ের উপর। বিচারালয়ের মর্যাদা তাই অতি উচ্চ ও সুমহান। বিচারালয়ে বিচার হবে প্রকাশ্য ও ন্যায্য। এখানে স্থান নেই কোন আবেগের বা নিভৃতির। এখানে সকল মানুষকে জ্ঞান করা হবে সমান। বিচারালয়ে রাজা ও প্রজা, ধনী ও নির্ধন একই মর্যাদার অধিকারী।

একটি প্রবাদ আছে যে, বিচার শুধু নিরপেক্ষ হলেই চলবে না, এটি যে নিরপেক্ষভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে তা প্রতীয়মান হতে হবে। বিচারকে নিরপেক্ষ প্রতীয়মান হতে হলে বিচারকে প্রকাশ্য হতে হবে।

বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী সকল ব্যক্তির অধিকার আছে শুনানি লাভের। এ বিষয়ে সকল পক্ষের অধিকার সমান। এক পক্ষের কথা শুনে বা সকল পক্ষকে শুনানির সমান সুযোগ না দিয়ে বিচার করা মানবাধিকার ঘোষণা লংঘন বলে গণ্য হয়।

অনুচ্ছেদঃ ১১

(১) কোন ব্যক্তিকে দন্ডনীয় অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হইলে, আইন অনুসারে প্রকাশ্য বিচারের মাধ্যমে অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলিয়া গণ্য হইবার

www.pathagar.com

অধিকার তাঁহার থাকিবে এবং অনুরূপ বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল নিশ্চয়তা তাঁহাকে দিতে হইবে।

(২) কোন ব্যক্তিকে এমন কোন কাজ করা বা না করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না, যে কাজ সংঘটনকালে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে দন্ডনীয় অপরাধ ছিল না। অপরাধ সংঘটনকালে আইন অনুসারে অনুরূপ অপরাধের জন্য যে দন্ড প্রযোজ্য ছিল তাহাকে উহা অপেক্ষা গুরুতর দন্ডও দেওয়া যাইবে না।

ভাষ্য

অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে তিনটি দূরতিক্রম্য কঠিন স্তর পার হতে হয়। মানবাধিকার ঘোষণার বিবেচনায় ঐ তিনটির কোনটির ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎমাত্র শিথিলতা উপেক্ষণীয় নয়।

প্রথম স্তরটি হচ্ছে এই যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কর্মকান্ড নিষ্পন্ন করেছেন তা সংশ্লিষ্ট আইনের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। সকল অন্যায় বা গুনাহ অপরাধ নয়, আবার এও হতে পারে যে, সকল অপরাধ অন্যায় বা গুনাহ নয়। যে মেয়ের বয়স সতর বছর এগার মাস উনত্রিশ দিন তেইশ ঘন্টা তার বিয়ে দেওয়া পিতার পক্ষে গুনাহ বা পাপ নয় কিন্তু শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অনুমতি নিয়ে মদ খাওয়া অপরাধ নয় কিন্তু সকল মুসলমানের জন্য পাপ। সুতরাং প্রথম স্তরে বিবেচনা করতে হবে উত্থাপিত অভিযোগগুলি আইনের চোখে অপরাধ বলে চিহ্নিত কিনা।

দ্বিতীয় স্তরে আসে এই অনুমান যে, সকল মানুষ নিরপরাধ। এই নিরপরাধ গণ্য হওয়ার যে অধিকার সেটি একান্তই মৌলিক। গল্প গুজবে যে মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ বলে চিহ্নিত সে মানুষ আসলে অত্যন্ত সৎও হতে পারে। সেজন্য ধরে নিতে হয় যে, সকল মানুষই সৎ। যিনি বলতে চান যে, কোন ব্যক্তি অপরাধী, পর্যাপ্ত এবং সন্দেহমুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা তাকেই প্রমাণ করতে হয় যে, ঐ ব্যক্তি অপরাধী। এখানে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার আছে, আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ পাওয়ার। সব পরিস্থিতি এবং সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনা করার পর যদি দেখা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী তবেই সে অপরাধী গণ্য হবে।

তৃতীয় স্তরে আসে দন্ড বা শাস্তির ব্যবস্থা। শাস্তির ক্ষেত্রে ভূতাপেক্ষ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। টুপি মাথায় না দেওয়া যদি অপরাধ হয় তবে এই অপরাধ ঘোষণাকারী আইন যেদিন জারি হয়েছে তার আগের দিনের খালি মাথার মানুষ শাস্তি পাবে না।

অনুচ্ছেদঃ ১২

কোন ব্যক্তির গোপনীয়তা, পরিবার, গৃহ অথবা চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপ করা যাইবে না; এবং তাঁহার সম্মান ও সুনামের উপর আঘাত করা যাইবে না। অনুরূপ হস্তক্ষেপ অথবা আঘাতের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রহিয়াছে।

ভাষ্য

পারিবারিক নিভৃতি এবং যোগাযোগের গোপনীয়তা সংরক্ষণ একটি মানবিক অধিকার।

www.pathagar.com

প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক গৃহের আছে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা, প্রত্যেক পরিবারের আছে একটি বিশিষ্ট মহিমা। এগুলির ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ মানুষের মহিমা ও মর্যাদার উপর জুলুম।

যোগাযোগ বা চিঠিপত্রের গোপনীয়তাও এমন একটি মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের সহায়ক সম্পদ যে, তার খেলাপ সাধারণতঃ সহনীয় নয়। আমি কখন কাকে কিভাবে কি লিখছি বা বলছি তা যদি কোন সতর্ক প্রহরায় শ্যেনচক্ষুর আওতায় থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমার লেখা বা বলা পরিণত স্ফূর্তি পায় না, লেখা বা বলা তখন আড়ষ্ট হয়ে যায়। সেই আড়ষ্টতা মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে কঠিন বাধা।

মানুষের সুনাম একটি দুর্লভ সম্পত্তি। এই সুনামের উপর মৃদু আঘাতও আহত ব্যক্তির বুকে কঠিন হয়ে বিঁধে। সুনাম সংরক্ষণের জন্য তাই মানবাধিকারের এই ঘোষণা। এইগুলি ব্যাহত হলে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার সকলেরই রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

(১) রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাফেরা ও বসবাস করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রহিয়াছে।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ দেশসহ যেকোন দেশ ত্যাগ করা এবং তাঁহার নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করার অধিকার রহিয়াছে।

ভাষ্য

রাষ্ট্র একটি অখন্ড সত্তা এবং সমগ্র রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ধূলিকণায় সংগঠিত প্রত্যেকটি ভূমিতে সকল নাগরিকের পদচারণার অধিকার নিশ্চিত। এই অধিকার মানবাধিকার রূপে চিহ্নিত। রাষ্ট্রের মধ্যে প্রদেশ থাকতে পারে। থাকতে পারে বিভাগ বা উপবিভাগ। সেগুলি প্রশাসনিক ব্যবস্থা মাত্র। নাগরিকের অধিকার এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা দ্বারা খর্বিত হয় না।

দেশের মধ্যে যেমন, দেশ থেকে বের হওয়া এবং ফিরে আসাও তেমনি মানবাধিকার। যেদিন মানুষ সমুদ্র পার হওয়াকে প্রায়শ্চিত্তযোগ্য পাপ মনে করতো সেদিন এবং সেকাল শেষ হয়ে গিয়েছে। দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এগুলিও তাই মানবাধিকার রূপে চিহ্নিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির নির্যাতন–নিপীড়নের কারণে অপর দেশে আশ্রয় প্রার্থনা ও আশ্রয় ভোগ করার অধিকার আছে।

(২) প্রকৃত অরাজনৈতিক অপরাধ অথবা জাতিসংঘের উদ্দেশ্যাবলী ও নীতিসমূহের পরিপন্থী ক্রিয়াকলাপের জন্য কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হইলে, এই অধিকারের আশ্রয় গ্রহণ করা যাইবে না।

ভাষ্য

প্রত্যেক মানুষ এই বিশ্বের অধিবাসী। আবার প্রত্যেক মানুষ একটি অঞ্চলের অধিবাসী। এই

www.pathagar.com

অঞ্চল ভৌগোলিক হতে পারে যেমন এই পৃথিবী এখন সাতটি মহাদেশে বিভক্ত। জলবায়ু ও তাপের নিরীখে এই পৃথিবী আবার কতিপয় ভাগে বিভক্ত। যেমনঃ উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চল, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ইত্যাদি। এই অঞ্চল আবার রাজনৈতিকও হতে পারে। যেমনঃ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান। এই রাজনৈতিক অঞ্চলগুলি দেশ নামে চিহ্নিত। চিহ্ন যেভাবেই দেয়া হোক না কেন এবং এ আঞ্চলিকতা যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন মানুষ যে বিশ্বের অধিকারী একথাকে অস্বীকার করা অসত্যকে প্রশ্রয় দেয়ার শামিল।

যে মানুষ নিজের দেশে নিগৃহীত, বিশ্বের মানুষ হিসেবে তার অধিকার আছে অপর দেশে আশ্রয় পাবার। এই অধিকার অস্বীকার করার নাম বিশ্বমানবতার প্রতি অশ্রদ্ধা বোধ।

যে দেশ পরদেশের আশ্রয় প্রার্থনাকারীকে আশ্রয় দেয়, সেদেশ ঐ পরদেশের শত্রু নয়, আশ্রয় প্রদানকারী দেশ মনবতারই সেবা করে।

কিন্তু আশ্রয় যারা চান তারা যদি নিগৃহীত হন, তাদের কোন অপরাধের জন্য কিংবা এমন কিছুর জন্য যা নীতিভিত্তিক নয়– সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির আশ্রয় প্রার্থনার কোন অধিকার থাকে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

(১) প্রত্যেকের জাতীয়তা লাভের অধিকার রহিয়াছে।

(২) কোন ব্যক্তিকে তাঁহার জাতীয়তা হইতে স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে বঞ্চিত করা যাইবে না কিংবা তাঁহার জাতীয়তা পরিবর্তন করার অধিকারকেও অস্বীকার করা যাইবে না।

ভাষ্য

মানুষের কিছু পরিচয় আছে যেগুলো লাভ করার ব্যাপারে নিজস্ব কোন অধিকার বা দায়িত্ব নেই। যে পরিবারে এবং যে দেশে এবং যে পিতার ঔরসে এবং মাতার গর্ভে দবির জন্মগ্রহণ করেছে, সেই পরিবার, দেশ এবং পিতা–মাতা তার পরিচয়। এই পরিচয় এতই স্বাভাবিক যে, এগুলো থেকে দবিরকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

আমরা সকলেই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি, এটি যেমন সত্য আমরা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছি এটিও তেমনি সত্য। বাংলাদেশে জন্ম গ্রহণ করে আমরা বাংলাদেশী হয়েছি। এই জাতীয়তাকে আমরা গৌরবের মনে করি।

জাতীয়তাবাদের একটি অহংকার আছে; সেই অহংকার কিছু আবেগের জন্ম দেয়। সেই আবেগ মহামূল্যবান। এই আবেগের বশবর্তী হয়ে মানুষ তার জাতীয়তা রক্ষার জন্য বহু কিছু বিসর্জন দিতে পারে এমনকি জীবনও। জাতীয়তা লাভের অধিকার তাই একটি মানবাধিকার।

যার যা জাতীয়তা, তার অধিকার আছে সেই জাতীয়তা সংরক্ষণের। এই অধিকার হরণ করা যায় না অকারণে। তবে কেউ যদি পরিবর্তন করতে চায়, সে অধিকার তার আছে। সে একজন বিশ্বনাগরিক। তাই এই অধিকার তার মৌলিক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

(১) জাতি, জাতীয়তা অথবা ধর্মের ভিত্তিতে কোনরূপ সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে,

www.pathagar.com

পূর্ণবয়স্ক সকল পুরুষ ও নারীর বিবাহ এবং পরিবার প্রতিষ্ঠা করার অধিকার রহিয়াছে। বিবাহ সম্পর্কে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার লাভের যোগ্য।

(২) ভাবী দম্পত্তির অবাধ ও পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতেই কেবল বিবাহ বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(৩) পরিবার হইতেছে সমাজের স্বাভাবিক ও মৌল গোষ্ঠী—একক (group unit) এবং উহা সমাজ ও রাষ্ট্রের রক্ষণলাভের অধিকারী।

ভাষ্য

নারী এবং পুরুষ মিলে যে একক, তার মহিমা অপার। যেমন নারী তেমন পুরুষ, একজন অন্যজনের পরিপূরক। এদের মিলনেই মানব জীবনের পূর্ণতা। বিবাহের মাধ্যমে এই মিলন অবাধ হয়।

এই মিলনে কোন বাধা থাকা উচিত নয়, উচিত নয় ভেদাভেদ জাতি বা ধর্মের কারণে। প্রত্যেক পুরুষ এবং নারীর অধিকার থাকা উচিত বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার। এটি একটি মহান মানবাধিকার।

নারী–পুরুষের মিলনের মধ্যে যে বন্ধন সেটি শৃঙ্খলার জন্য, শৃঙ্খলের জন্য নয়। মিলন যখন শেকল হয়ে পা বাঁধে তখন সে মিলন ভেঙ্গে যাওয়াই উচিত। এবং সেই ভাঙ্গার অধিকার যেমন পুরুষের তেমনি নারীর। এখানেও কোন অসমতা থাকা উচিত নয়। বিবাহের ভিত্তি যেমন নারী–পুরুষের অবাধ সম্মতি, বিবাহ বিচ্ছেদেরও ভিত্তি তাদের পূর্ণ অভিপ্রায়ে।

বিবাহের মাধ্যমে নারী–পুরুষের বাঞ্ছিত ফল সন্তান। স্বামী–স্ত্রী এবং সন্তান নিয়ে পরিবার। পরিবার গঠন এবং সংরক্ষণের অধিকার মৌলিক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

(১) প্রত্যেক ব্যক্তি এককভাবে এবং অন্যান্যের সহিত যৌথভাবে সম্পত্তির মালিক হইবার অধিকারী।

(২) কোন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে তাঁহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

ভাষ্য

মানুষকে বাঁচতে হলে তার কিছু সহায়সম্বল চাই। এই সহায়সম্বলের অপর নাম সম্পত্তি। যে কপর্দকহীন, তার যত আস্ফালনই থাক না কেন, সে আসলে শক্তিহীন।

মানুষকে বাঁচতে হলে, সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে হলে, পূর্ণভাবে বিকশিত হতে হলে তার প্রয়োজন এমন কিছু সম্বল যা তাকে আশ্রয় দিতে পারে বিপদের দিনে, প্রবর্তনা দিতে পারে সম্পদের দিনে।

সম্পত্তির অধিকার তাই মানবাধিকার রূপে চিহ্নিত হয়েছে। এই মানবাধিকার শুধু অর্জনে ও বর্জনে সীমায়িত নয়, এর বিস্তৃতি সম্পত্তির সংরক্ষণেও। কোন মানুষ বঞ্চিত হবে না তার সম্পত্তি থেকে অকারণে কিংবা অন্যায় কারণে বা অপর্যাপ্ত কারণে। যার লাঠি তার মাটি এ নীতি চলবে না।

www.pathagar.com

যা আমার নিজের, তা আমার একান্তই নিজের; সেখানে যদি অন্যের উপদ্রবের উদ্যত আশংকা আমাকে পীড়িত করে তবে সে সম্পদ আমার হয়েও পূর্ণভাবে আমার থাকে না। যার যেটুকু আছে তার সেটুকু রাখবার নিশ্চিতিও তাই মানবাধিকার।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার আছে; এই অধিকারের মধ্যে তাঁহার ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করার স্বাধীনতার এবং একা বা অন্যান্যের সহিত সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া এবং প্রকাশ্যে অথবা গোপনে শিক্ষাদান, অনুশীলন, ধর্ম অনুষ্ঠান এবং পালনের মাধ্যমে নিজ ধর্ম এবং বিশ্বাস অভিব্যক্ত করার স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত।

ভাষ্য

ধর্ম সংজ্ঞার উর্ধ্বে। মন নিয়ে ধর্মের কারবার। মানব মন বিচিত্র; তাই ধর্মের ধারণাও বিচিত্র। যদি বলি ঈশ্বরই ধর্মের ভিত্তি। অর্থাৎ যেখানে ঈশ্বর নেই সেখানে ধর্ম নেই –তাহলে সত্য ভাষণ হবে না। বৌদ্ধদের একটি বিরাট অংশ নিরেশ্বরবাদী। কিন্তু তাই বলে বৌদ্ধ ধর্ম যে ধর্ম নয় এমন কথা বলা যায় না।

এই সব জটিলতার মধ্যেও ধর্মের পরিচয়ের একটি সাধারণ সূত্র বের করা যায়। যে দল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় যেসব আচার, সংস্কার বা বিশ্বাসকে তাদের ধর্ম বলে মনে করে সেটাই তাদের ধর্ম।

কোন ধর্মের মধ্যে জন্মলাভ করে সেই ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা কিংবা নতুন কোন ধর্ম গ্রহণ করা কিংবা গ্রহণের পর একটিকে বর্জন করে অন্যটিতে আশ্রয় করা–একাজগুলি মানুষের চিন্তার, বিবেকের এবং বিশ্বাসের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এই অধিকার একপ্রকার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা অনুচিত। এটি তাই একটি মানবাধিকার।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

প্রত্যেক ব্যক্তির মতামত ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার আছে; এই অধিকারের মধ্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে মতামত পোষণের অধিকার এবং যেকোন বাহনের মাধ্যমেও সীমান্তনির্বিশেষ তথ্য ও ভাব–ধারণা অন্বেষণ করা, গ্রহণ করা ও প্রদান করার স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত।

ভাষ্য

জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন। স্বাধীন শুধু কর্মে নয়, স্বাধীন ভাব প্রকাশেও। প্রত্যেক মানুষ জন্মগতভাবে স্বতন্ত্র। একজনের চলাবলা অন্যজনের চলাবলার সাথে মেলে না। সৃষ্ট হয়েছে সে স্বতন্ত্রভাবে। এই স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ তাই প্রকৃতির অভিপ্রায়। প্রকৃতি সকল মানুষকে একই মাপে ও ছাঁচে গড়তে পারতেন। তা যে গড়া হয়নি এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক মানুষের পূর্ণ সার্থকতার জন্য তার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ অপরিহার্য।

মানুষ যা বলতে চায়, তা তার স্বাতন্ত্র্যেরই পরিচয় বহন করে। সকলে যে এককথা বলবে না তা ধরেই নিতে হয়; কারণ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। বলার বা ভাবপ্রকাশের এই অধিকার তাই মৌলিক।

www.pathagar.com

মানুষ তার ভাবপ্রকাশ করতে পারে নানান ভাবে ও ঢঙ্গে। পশুদের সে ক্ষমতা নেই। মানুষের এই অধিকারকে কেউ যদি হরণ করে তবে সে মনুষ্যত্বকে হরণ করে।

ভাবপ্রকাশের অধিকার তাই একটি মহান মানবাধিকার।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়া ও সংঘ গঠনের স্বাধীনতার অধিকার আছে।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন সংঘের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য বাধ্য করা যাইবে না।

ভাষ্য

প্রত্যেক মানুষ যেমন স্বতন্ত্র এবং একক আবার প্রত্যেক মানুষই তেমনি তার বাঞ্ছিত দলের বা গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের অংশ। এক অংশের অধিকার আছে অন্য অংশের সাথে মিলিত হবার এবং মিলিত হয়ে কোন অভীষ্টকে পূর্ণ করবার।

একজন যা ভাবে তার ভাবনা যে পাগলামি নয়, এটা প্রমাণ করবার জন্য প্রয়োজন পড়ে তার ভাবনাকে অন্যমনে সঞ্চারিত করবার। এই সঞ্চরণের ফলে গড়ে উঠে দল, গড়ে উঠে গোষ্ঠী। সমমনা মানুষেরা সংঘ গড়ে। সকলের মনে যখন একই ভাবনা এবং অভীষ্ট যখন একই, তখন তাদের বল হয় বেশী। এই বলের প্রভাবেই তারা কামিয়াব হয়।

সুতরাং সংঘ গঠনের যে অধিকার তা মৌলিক। তবে এই সংঘের ভিত্তি হতে হবে স্বেচ্ছামূলক। সংখ্যাগুরুর সংঘ দাবী করতে পারবে না সংখ্যালঘুর দলকে তাদের সাথে মিলে যেতে বা দল পরিবর্তন করতে। কোন প্রভাব বা শক্তি দলভুক্তির ভিত্তি হতে পারবে না। এই অধিকারও মৌলিক এবং এগুলো মানবাধিকার।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির তাঁহার দেশের শাসন–ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করার অধিকার রহিয়াছে।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তির তাঁহার দেশের সরকারী কর্মে প্রবেশের সমান অধিকার রহিয়াছে।

(৩) জনগণের ইচ্ছাই হইল সরকারের কর্তৃত্বের ভিত্তি; এই ইচ্ছা নিয়মিত ব্যবধানে অনুষ্ঠিত নির্ভেজাল নির্বাচনের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হইবে এবং সার্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ও গোপন ভোট অথবা সমতুল্য অবাধ ভোট–পদ্ধতির মাধ্যমে অনুরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

ভাষ্য

আমি স্বাধীন, এর অর্থ কি? এর অর্থ এই যে, আমার তৈরী আইন দ্বারা আমি নিয়ন্ত্রিত হব। অন্য কেউ যদি আইন বানায়, স্বাধীন মানুষ হিসাবে আমার অধিকার আছে সে আইন না মানার। লাঠির জোরে আমাকে আইন মানতে বাধ্য করা হলে সেটি হবে স্বৈরাচার।

www.pathagar.com

কিন্তু প্রত্যেক মানুষের পক্ষে আইন তৈরী করা সম্ভব নয়, স্বাভাবিকও নয়। এই জটিল পরিস্থিতির একটা সুরাহা বের করেছে সভ্যজগৎ। সেই সুরাহার নাম নির্বাচন। আমরা দশজনে মিলে যদি একজনকে নির্বাচন করি আইন তৈরীর জন্য, তবে ধরে নেয়া যায় যে, তার প্রণীত আইন আমারই প্রণীত আইন।

নির্বাচন তাই এমন একটি মৌলিক অধিকার যা থেকে বঞ্চনা করার অপর নাম স্বাধীনতা হরণ।

দেশের প্রত্যেক মানুষই দেশের মালিক। সেই মালিকানা সে যাকে যতটুকু দেয় তার পক্ষে সে ততটুকু পরিচালনা করতে পারে। সকল মানুষের অধিকার আছে শুধু মালিকানার দাবীর সংরক্ষণ করার নয় বরং সরকারী কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করার।

নির্বাচন এবং সরকারী কাজে অংশগ্রহণ তাই মানবাধিকার রূপে চিহ্নিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

প্রত্যেক ব্যক্তির সমাজের সদস্য হিসাবে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রহিয়াছে, এবং তিনি জাতীয় প্রচেষ্টা অথবা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের সংগঠন ও সংস্থান অনুসারে, তাঁহার মর্যাদা এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের অবাধ উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বাস্তবায়নের দাবীদার।

ভাষ্য

রবিনসন ক্রুসোর কোন দায়দায়িত্ব ছিল না কারো প্রতি, ফলে অধিকারও ছিল না কারো উপর। জনহীন দ্বীপে যেহেতু তিনি একা তাই অধিকার ও দায়িত্বের প্রশ্ন তার কাছে অবান্তর।

বাংলাদেশের কোন নির্জন দ্বীপে যদি একজন মানুষ বসতি স্থাপন করে তাহলে সেই মানুষটির দায় ও অধিকার থাকে না। কিন্তু সেই মানুষটি যখন আরো মানুষ নিয়ে যায় দ্বীপে এবং সঙ্গে নিয়ে যায় একটা বিয়ে করা বউ তখন অবস্থা দাঁড়ায় অন্যরকম। নিজের যখন ছেলেমেয়ে হয় এবং অন্যরাও যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে তখন পরিস্থিতি আর দায় ও অধিকারহীন থাকে না। তখন তারা সমাজবদ্ধ হয় এবং একে অন্যের প্রতি অধিকার ও দায়ে আবদ্ধ হয়।

সমাজ থেকে দেশ, দেশ থেকে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র থেকে বিশ্ব, এমনি করে বৃত্তের পরিধি বাড়ে। এই বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে মানুষের অধিকারের দাবী স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

প্রত্যেক মানুষের আছে একটি মর্যাদা, আছে একটি ব্যক্তিত্ব। এই মর্যাদা সংরক্ষণ এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ সকলের কাম্য। এবং এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক নিরাপত্তা। সব রাষ্ট্রের অবস্থা সমান নয়। যার যা সাধ্য সেই অনুযায়ী রাষ্ট্র পূরণ করে নাগরিকের আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার। নাগরিকের জন্য এগুলি মানবাধিকার।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ করার অধিকার, স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচন করার

www.pathagar.com

অধিকার, ন্যায় ও সন্তোষজনক কর্মের শর্ত এবং বেকারত্বের বিরুদ্ধে রক্ষণলাভের অধিকার আছে।

(২) কোনরূপ ভেদাভেদ ব্যতীত, সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক লাভের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রহিয়াছে।

(৩) যেসব ব্যক্তি কাজ করে তাঁহাদের প্রত্যেকের ন্যায্য ও সন্তোষজনক পারিশ্রমিক লাভের অধিকার রহিয়াছে যাহাতে তিনি এবং তাঁহার পরিবার মানবিক মর্যাদার সহিত জীবনযাপন করিতে পারেন; এবং প্রয়োজন হইলে, উহার পরিপূরক হিসাবে অন্যান্য সামাজিক রক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও উহাতে যোগদানের অধিকার রহিয়াছে।

ভাষ্য

কর্মই জীবন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই শুরু হয় শিশুর নড়াচড়া। সেই টুকুই তার কর্ম। পশুর জীবনে শৈশবকাল সংক্ষিপ্ত। তাদের সকল শক্তি সহজাত। মানুষের শিশু-কিশোর কাল দীর্ঘ। এই দীর্ঘ মেয়াদের সময়ে তারা অর্জন করে নানা প্রকার দক্ষতা। এই দক্ষতা তার ব্যক্তিগত সঞ্চয়।

এই অর্জিত দক্ষতার ভিত্তিতে সে লাভ করেছে কর্মের অধিকার, পেশার অধিকার। সে কাজ করবে অনুকূল পরিস্থিতিতে, ন্যায়ানুগ অবস্থায়, এটি তার অধিকার। সে যে কাজ করবে তা যদি বেতনযুক্ত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সে বৈষম্যহীনতা দাবী করতে পারে। শুধু বৈষম্যহীনতা নয়, পর্যাপ্ততাও তার অধিকার। সে নিয়মিত কাজ করবে এবং খেতে পাবে কম, এটি হয়না। নিজের জন্যে এবং পরিবারের জন্য মর্যাদার সাথে জীবন যাপনের জন্য যা প্রয়োজন, কর্মের মাধ্যমে তা আয় করবার অধিকার তার থাকতে হবে।

যারা নিয়োজিত হন এবং যারা নিয়োগ করেন এই দুই শ্রেণীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে নিয়োগ কর্তাই অধিকতর শক্তিধর। এই শক্তি প্রয়োগে সে তার কর্মচারীকে শোষণ করতে পারে। এই শোষণের মোকাবেলায় একজন কর্মচারী একেবারেই শক্তিহীন। মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন সংঘ গঠনের, কর্মীদের সংঘ কর্মচারীদের সংঘ। স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং তাতে যোগদান একটি মানবাধিকার।

অনুচ্ছেদ : ২৪

প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্রাম ও অবকাশ লাভের অধিকার রহিয়াছে; ইহার মধ্যে দৈনিক কর্মঘন্টার যুক্তিসংগত সীমিতকরণ এবং সময়ে সময়ে সবেতন ছুটির অধিকার অন্তর্ভুক্ত।

ভাষ্য

শুধু কর্ম দিয়েই যে মানুষের জীবন ঠাসা, সে মানুষ জীবনের কাছে বন্দী। সে বিশ্ব - কারাগারের কয়েদী।

www.pathagar.com

মানুষের তাই দাবী আছে যেমনি কর্মের, তেমনি অবসরের। তেমনি বিশ্রামের। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে All work and no play makes jack a dull boy. জীবনের বিকাশের জন্য, স্ফূর্তির জন্য চাই অবসর। এই দাবীকে মানবাধিকার রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। মানুষের কর্মশক্তিও সীমাহীন নয়। অহোরাত্র সে কর্মে নিযুক্ত থাকতে পারে না। সে কারণে তার কম সময় নির্ধারিত থাকা উচিত। প্রতিদিন সে কাজ করবে ছয় থেকে আট ঘন্টা, রাতে কাজ করলে দিনে ঘুমাবে। শুধু তাই নয়, সে ছুটি পাবে সপ্তাহে বা মাসে বা বছরে নির্ধারিত মেয়াদ অন্তে। এই ছুটির সময় সে বেতন পাবে। এটিও তার মানবাধিকার।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের এবং তাঁহার পরিবারের স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবা (Social services) সহ জীবনযাত্রার পর্যাপ্ত মানের অধিকার রহিয়াছে, এবং বেকারত্ব, রোগ, অসামর্থ্য, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা তাঁহার নিরাপত্তা লাভের অধিকার আছে।

(২) মাতা ও শিশুরা বিশেষ যত্ন ও সাহায্য লাভের অধিকারী। বিবাহবন্ধনের অধীনে অথবা বাহিরে যেভাবেই জন্মলাভ করুক না কেন, সকল শিশু সমান সামাজিক আশ্রয় ভোগ করিবে।

ভাষ্য

প্রত্যেক মানুষের ন্যূনতম দাবী হচ্ছে, তার এবং তার পরিবারের ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য; (১) খাদ্য, (২) বস্ত্র, (৩) গৃহ, (৪) চিকিৎসা, (৫) নিরাপত্তা এবং (৬) অন্যান্য সামাজিক সেবার।

নিজের কোন দোষে নয়, নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অনেক কারণ ঘটতে পারে যাতে তার এই অধিকারগুলো বিপন্ন হয়। সেই কারণগুলোর মধ্যে আছে (১) বেকারত্ব (২) বিমার (৩) বৈধব্য (৪) বার্ধক্য এবং (৫) নৈসর্গিক পরিস্থিতি। এই সব অবস্থাতেও নিরাপত্তার দাবী সে করতে পারে। কারণ সেটি তার মানবাধিকার।

শিশু যখন গর্ভে থাকে তখন প্রসূতির জন্য প্রয়োজন বিশেষ যত্ন এবং সহায়তা। জন্মের পরও দীর্ঘকাল মানুষ থাকে অসহায় এবং তার জন্য দরকার বিশেষ যত্ন ও সহায়তা। মাতা ও সন্তানের অধিকার আছে এই যত্ন ও সহায়তা লাভের।

পিতার ঔরসে এবং মাতার গর্ভে সন্তান জন্মলাভ করে। পিতা ও মাতা বিবাহিত হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। যত্ন এবং সহায়তার অধিকার সকল সন্তানের একরকম, তা সে বিবাহজাত হোক, বিবাহ বহির্ভূত হোক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষা লাভের অধিকার রহিয়াছে। অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক এবং

www.pathagar.com

মৌলিক স্তরে শিক্ষা অবৈতনিক হইবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। কারিগরি এবং পেশাদারী (Professional) শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য হইবে এবং উচ্চ শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(২) মানব ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন এবং মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান জোরদার করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালনা করিতে হইবে। শিক্ষা সকল জাতি, বংশ বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা, সহনশীলতা ও মৈত্রীর উন্নতি বর্ধন করিবে এবং শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতার অগ্রায়ণ সাধন করিবে।

(৩) সন্তানদিগকে কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা নির্বাচন করার অগ্রাধিকার পিতামাতার থাকিবে।

ভাষ্য

শিক্ষার অধিকার সকল মানুষের জন্য মৌলিক। মানুষকে মানুষ হতে হলে শিক্ষা তার জন্য অপরিহার্য। আজকের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যখন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে নানাভাবে তখন শিক্ষাহীনতা একটি দুর্ভাগ্যজনক অভিশাপ।

মানবাধিকারের ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাকে করতে হবে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্রকে এই দায়িত্ব নিতে হবে। কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা তারাই পাবে যাদের এদিকে প্রবণতা আছে। আর উচ্চ শিক্ষা লাভের অধিকার তাদেরই থাকবে, যারা মেধাবী।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে তিনটি ঃ (১) ব্যক্তিত্বের পূর্ণ এবং সফল বিকাশ, (২) মানবাধিকারের প্রতি মর্যাদা দৃঢ়করণ এবং (৩) মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ। শিক্ষার অভীষ্ট চারটি ঃ (১) সকল জাতির মধ্যে সমঝোতা বৃদ্ধি, (২) সকলের মধ্যে সহনশীলতা সৃষ্টি, (৩) সকলের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা এবং (৪) বিশ্বে শান্তির জন্য জাতিসংঘের কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদান।

শিশুদের শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারণের অধিকার পিতামাতার। দেশে নানা প্রকার শিক্ষা থাকতে পারে। রাষ্ট্র নানাবিধ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করতে পারে। সেগুলোর মধ্যে যেকোন একটিকে সন্তানের জন্য বেছে নেয়ার অধিকার পিতামাতার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির তাঁহার সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশ গ্রহণ করার, শিল্পকলা উপভোগ করার এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও উহার সুফলের ভাগীদার হইবার অধিকার আছে।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ বৈজ্ঞানিক, সাহিত্য অথবা শিল্পকর্মের ফলে উৎপন্ন নৈতিক অথবা বস্তুগত স্বার্থসংরক্ষণের অধিকার রহিয়াছে।

www.pathagar.com

ভাষ্য

প্রত্যেক মানুষের একটি সাংস্কৃতিক জীবন আছে। তার অশন, ভূষণ, গৃহায়ণ, অলংকরণ, চিত্রায়ণ প্রভৃতির মধ্যে যে বিশিষ্টতা স্বতঃপ্রতীয়মান সেটি তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানুষকে বিশিষ্টতা দেয়। একে অপরের মধ্যে প্রবিষ্ট। সাংস্কৃতিক জীবনে যুক্ত হওয়া তাই মানবিক অধিকার।

তার দেশ এবং সমাজ যে শিল্প প্রতিষ্ঠা করে, তার দেশ ও সমাজ যে বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়ায় বিত্তবান হয় সেগুলো উপভোগ করা তার মানবাধিকার। তার দেশের শিল্প ও বিজ্ঞান তার অহংকার।

মানুষ সৃষ্টি করে সাহিত্য ও শিল্প এবং অবদান রাখে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। এগুলো তার ব্যক্তিগত সম্পদ। যার মেধায়, প্রজ্ঞায়, প্রতিভায় এবং সর্বশেষে শ্রমে যা সৃষ্টি হয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেগুলো তারই সম্পদ। এই সম্পত্তির উপর তার স্বত্ব একটি মানবাধিকার।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

এই ঘোষণায় বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়নের উপযোগী সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পদ্ধতি (order) লাভের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রহিয়াছে।

ভাষ্য

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় অনেক অধিকারের কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে স্বাধীনতার কথা। এই অধিকার ও স্বাধীনতা আকাশ থেকে পড়ে না। এগুলোকে লালন করতে হয়। এবং সংরক্ষণের জন্য শত্রুর মোকাবেলা করতে হয়।

একদিন হয়তো ছিল যখন এইসব অধিকার ও স্বাধীনতা মানুষ ভোগ করতো, সেই যুগ স্মরণাতীত। কালে কালে এবং ক্রমে ক্রমে মানুষের উপর মানুষ চালিয়েছে অনেক অন্যায়, অনেক জুলুম, অনেক অব্যবস্থা। শক্তিমানের দাপটে মানুষের মৌলিক অধিকার হয়েছে ভূলুণ্ঠিত।

আধুনিককালে আবার মানুষ ক্রমে ক্রমে সচেতন হচ্ছে মানবাধিকারের প্রতি। মানুষ আজ বুঝতে পারছে মানুষের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে নইলে মনুষ্য জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তারা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে মানবাধিকার রক্ষা না হলে বিশ্বের শান্তি বিনষ্ট হবে, মানুষে মানুষে হানাহানি বাড়বে এবং পরিণামে মানুষ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে।

মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য তাই প্রয়োজন এক আন্তর্জাতিক নীতিমালা। সেই নীতিমালার দাবী সকল মানুষের মানবাধিকার।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

(১) কেবল সমাজের মধ্যে মানব ব্যক্তিত্বের অবাধ ও পূর্ণবিকাশ সম্ভব এবং সেই সমাজের প্রতি প্রত্যেকের কর্তব্য রহিয়াছে।

(২) কেবল অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের যথাযথ স্বীকৃতি এবং সেইগুলির প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজের নৈতিকতা,

www.pathagar.com

জনশৃংখলা এবং সাধারণ কল্যাণের স্বার্থে ও ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ উপভোগের ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা বাধানিষেধ আরোপ করা যাইতে পারে।

(৩) এই সকল অধিকার ও স্বাধীনতার প্রয়োগ কোনক্রমেই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহের পরিপন্থী হইবে না।

ভাষ্য

মানুষ একা বাঁচে না, যার জীবনে ভালবাসা নেই, যার জীবনে হাসিকান্না নেই, তার জীবন পশুর জীবন। বাঁচার মত বাঁচতে হলে তাই মানুষকে হতে হয় সমাজবদ্ধ। সমাজ গঠিত হয় অনেক মানুষ নিয়ে। প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে সফলভাবে বাঁচার। অনেক মানুষ নিয়ে যেহেতু সমাজ তাই একের অধিকার অন্যের অধিকার দ্বারা সীমায়িত। স্বাধীন দবিরের যে অধিকার স্বাধীন সাবেতেরও সেই অধিকার। দবির ব্যায়াম করতে গিয়ে তার নিক্ষিপ্ত হাত দ্বারা সাবেতকে আঘাত করতে পারে না। সাবেতের নাক যেখানে শুরু দবিরের স্বাধীনতা সেখানে শেষ। যে অধিকারের সীমা সম্পর্কে সচেতন নয়, সে অধিকার দাবী করতে পারে না।

মানবাধিকারের সীমা পাঁচটি ঃ (১) অন্যের অধিকারের স্বীকৃতি এবং মর্যাদা (২) অন্যের স্বাধীনতার স্বীকৃতি ও মর্যাদা (৩) স্বীকৃত নৈতিকতা (৪) জনশৃঙ্খলা এবং (৫) জনকল্যাণ।

স্বাধীনতা এবং অধিকারকে সামঞ্জস্য হতে হবে জাতিসংঘের নীতি এবং উদ্দেশ্যের সাথে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

এই ঘোষণার কোন কিছুরই এমন ব্যাখ্যা প্রদান করা যাইবে না যাহার অর্থ দাঁড়ায় যে, ইহাতে বর্ণিত কোন অধিকার এবং স্বাধীনতা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র, গোষ্ঠী অথবা ব্যক্তির কোন কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার বা কোন কাজ সম্পাদন করার অধিকার রহিয়াছে।

ভাষ্য

জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় যেসব স্বাধীনতা এবং অধিকারের কথা বলা হয়েছে সেগুলো নানাভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এই বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করতে পারে (১) রাষ্ট্র (২) দল এবং (৩) ব্যক্তি। তারা ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে আবিষ্কৃত নীতিকে প্রয়োগ করতে পারে তাদের কর্মকান্ডে।

এখানে ছোট একটি হুঁশিয়ারি প্রয়োজন। কোন রাষ্ট্রের, দলের বা মানুষের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে এমন কিছু আবিষ্কার করা এবং সেই আবিষ্ক্রিয়ার ফলে এমন কোন কর্মকান্ডে নিযুক্ত হওয়া অন্যায়, যা মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় বিধৃত অধিকার ও স্বাধীনতার পরিপন্থী।

www.pathagar.com

মৌলিক অধিকার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৬ থেকে ৪৬ অনুচ্ছেদে যেসব অধিকার বিধৃত, আইনগতভাবে কেবলমাত্র সেইগুলিই মৌলিক অধিকার।

অনুচ্ছেদঃ ২৬

(১) এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান–প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

(৩) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

ভাষ্য

বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মূলকথা হচ্ছে মৌলিক অধিকার। এই অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে মৌলিক অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা দরকার।

মৌলিক অধিকার কাকে বলে?

প্রথমেই দার্শনিক দিক থেকে বিবেচনা করা যাক্। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে কিছু সহজাত বৃত্তি আছে। এগুলো নিয়েই সে জন্মেছে। এই বৃত্তিগুলো স্বাভাবিক, অপরিহার্য ও চিরন্তন। মানুষের মাথার খুলির নীচে ঘিলু আছে। তাই দিয়ে সে চিন্তা করতে পারে। মানুষের জিহবার ও কানের গঠন প্রকৃতি এমন যে উহা দ্বারা সে অসংখ্য ধ্বনি করতে পারে, কথা বলতে পারে, গান গাইতে পারে। সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যে এগুলোর উদ্ভব ঘটেছে এবং সেকারণে এগুলোকে সহজাতভাবে সৃষ্টি বলা যায়। এই বৃত্তিগুলো মানুষের কৃত্রিম সৃষ্টি নয়। এগুলো প্রকৃতির সৃষ্টি, তাই মানুষ এগুলোকে নষ্ট করলে সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যায়। এই বৃত্তিগুলোর সংরক্ষণ এবং বিকাশ মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। অন্যথায় মানুষের মনুষ্যত্ব খর্ব হতে বাধ্য। মানুষকে যদি মানুষ থাকতে হয় তবে এ বৃত্তিগুলোকে বিকশিত হতে দিতে হবে। তাই এগুলো মৌলিক অধিকার।

আইনের চোখে অধিকার চার ধরনেরঃ

এক. যা মানুষ অন্যের নিকট থেকে, রাষ্ট্রের নিকট থেকে আইনসঙ্গতভাবে দাবী করতে পারে, তাকে অধিকার বলা হয়। আমার স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার আছে–তার অর্থ কারো দ্বারা আমি বাধাপ্রাপ্ত হবো না; হলে তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে পারবো। রাষ্ট্র আমাকে বাধা দিতে পারবে না, ব্যক্তি আমাকে বাধা দিতে পারবে না। এই যে দাবী এর নাম অধিকার, এটা এক প্রকার পাওনা।

www.pathagar.com

দুই. অধিকার এক প্রকারের স্বাধীনতা। কবিতা রচনা করার অধিকার আমার আছে। এর অর্থ কবিতা লিখবার স্বাধীনতা আমার আছে। আমি বেহালা বাজাতে চাই। এটা আমার স্বাধীনতা। এটাও এক প্রকার অধিকার।

তিন. অধিকারের অপর নাম ক্ষমতা। একজন মুসলমান তার মরহুমা স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করতে পারে—এটা পাওনা নয়, স্বাধীনতাও নয়। এটা একটা ক্ষমতা, যা অধিকারের পর্যায়ভুক্ত।

চার. বিশেষ নিরাপত্তাকেও অধিকার বলা যায়। অন্যায়ভাবে গুরুতর অপরাধ করলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারে, কিন্তু সরকারী কর্মচারী কার্যোপলক্ষে অনুরূপ গুরুতর অপরাধ করলে পুলিশ তাকে উর্ধ্বতন কর্মচারীর বিনানুমতিতে গ্রেফতার করতে পারেনা। এটাও এক ধরনের অধিকার।

অধিকারের মধ্যে যেগুলো মৌলিক সেগুলো রাষ্ট্র সৃষ্টির আগেও মানুষের মধ্যে ছিল। যেসব অধিকার রাষ্ট্র জন্মের আগেই মানুষের ছিল এবং যেগুলো খর্ব করা বা নষ্ট করা মনুষ্যত্বের পরিপন্থী সেগুলোর উপর রাষ্ট্র হাত দিতে পারে না। রাষ্ট্রকে পর্যন্ত রুখবার এই যে অধিকার এগুলোই মৌলিক অধিকার।

এখানে অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে, একেবারে আদিম যুগে মানুষ যখন সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে শিখেনি, তখন তাদের অধিকারের পরিসর ছিল বিপুল। সেসময় একজন খুন হলে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন খুনের বদলা নিতে পারতেন। তখন শক্তি বা গায়ের জোরই ছিল সকল অধিকারের উৎস। কিন্তু সামাজিক শৃঙ্খলার কারণে কালক্রমে মানুষের অধিকারের এলাকা সীমিত হয়ে গেল। তাই বলে অধিকার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। আজও সকল আইন-দার্শনিক স্বীকার করেন যে, কিছু কিছু অধিকার সকল সভ্য ও স্বাধীন মানুষের আছে, যে অধিকারগুলো মৌলিক; এবং সে কারণে অবিচ্ছেদ্য বলতে হবে।

এই অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে হলে ১ম দফার তিনটি বিষয় বিশ্লেষণ করতে হবে। বিষয় তিনটি হচ্ছে (১) প্রচলিত আইন (২) সংবিধান প্রবর্তন (৩) বাতিল।

প্রথম দফায় প্রচলিত আইনকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। বাতিল হওয়ার শর্ত হচ্ছে তা সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের সাথে অসমঞ্জস হবে। লক্ষ্যণীয় যে, বাতিল হবে শুধু ততটুকু যতটুকু অসমঞ্জস। সংবিধানের দ্বারা যেসব আইন বাতিল হয়নি সংবিধান প্রযুক্ত হওয়ার পর সেগুলোকে প্রচলিত আইন বলা হয়। ১৪৯ অনুচ্ছেদে এই আইনগুলোর হেফাজতের বিধান করা হয়েছে। সংবিধানের ১৪৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সকল প্রচলিত আইনের কার্যকরতা অব্যাহত থাকিবে, তবে অনুরূপ আইন এই সংবিধানের অধীন প্রণীত আইনের দ্বারা সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে।"

প্রচলিত আইন প্রসঙ্গে এই সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রচলিত আইন" অর্থ এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বা উহার অংশবিশেষে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় থাকুক বা না থাকুক, এমন যেকোন আইন।

১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বলবৎ হয়েছে। ঐ তারিখ থেকে এই অনুচ্ছেদের প্রথমদফায় বর্ণিত অইনসমূহ বাতিল হবে। যেহেতু সংবিধান

www.pathagar.com

দেশের সর্বোচ্চ আইন বলে বিবেচিত সেহেতু অন্য কোন আইন সংবিধানের পরিপন্থী হতে পারে না। সংবিধানের আইন ব্যাখ্যা করার কালে সমগ্র আইন সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করে সেই আলোকে অন্য আইনের সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য বিচার করতে হবে। তাই বলে সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইনকে বলবৎ রাখার জন্য সংবিধানের আইনকে অহেতুক সম্প্রসারিত করা যাবে না। যদি কোন আইন সংবিধানের এই অংশসমূহের কোন একটার বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়, তবে সেই আইন অকার্যকর হবে। এখানে আইন বাতিলের কথা বলা হয়েছে, রদ বলা হয়নি। রদ (Repeal) এবং বাতিল (Void) সমার্থক নয়।

একথা বলা যাবে না যে, সংবিধানের বিধানের দ্বারা সমঞ্জস আইন রদ হয়ে গেছে। রদকৃত আইন রদ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রীতিমত কার্যকরী। General Clauses Act –এর একটি ধারায় বলা হয়েছে যে, রদকৃত আইনের ধারা অনুযায়ী যে স্বত্ব–সুবিধা, অধিকার দাবী বা দায়িত্ব রদের পূর্বে অর্জিত বা নষ্ট হয়েছিল, তা তদ্রূপ থাকবে। কিন্তু যে আইন বাতিল, সে আইনের ধারা অনুযায়ী কার্যে এইরূপ কোন অর্জন বা বর্জন ঘটবে না। বাতিল আইনের আওতায় অর্জিত স্বত্ব বা অধিকার অগ্রাহ্য। এতদসত্ত্বেও যে আইন সংবিধানের বিধানের সঙ্গে অসমঞ্জস এবং সে কারণে বাতিল পরিগণিত হওয়ার যোগ্য, সেই আইন যতক্ষণ পর্যন্ত বাতিল ঘোষিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকরী।

এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় দফায় মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী আইন প্রণয়ন করতে রাষ্ট্রকে নিষেধ করা হয়েছে। আইন এবং রাষ্ট্র বলতে সংবিধানে কি বলা হয়েছে তা একটু দেখে নেয়া যাক। সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদ অনুসারে "আইন" অর্থ কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপআইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যেকোন প্রথা বা রীতি। আর "রাষ্ট্র" বলতে সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্র বলতে সংসদ, নির্বাহী বিভাগ এবং স্থানীয় প্রশাসন প্রভৃতিও বুঝায়।

আমাদের সংবিধানে অবশ্য রাষ্ট্র বলতে বিচার বিভাগকে বোঝানো হয়নি। আমাদের সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগে বিচার বিভাগের বিন্যাস করা হয়েছে। এই বিন্যাসে বুঝা যায় যে, সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক আইনের ব্যাখ্যা দ্বারা যদি কোন নজির ভিত্তিক আইন সৃষ্টি হয়, তবে সেই নবসৃষ্ট আইন সংবিধানের বিধানের সাথে অসমঞ্জস কিনা তা দেখবার এখতিয়ার কারো নেই।

রাষ্ট্র সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের সাথে অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করতে পারেন না সত্য কিন্তু প্রণয়নকালে তাকে বাধা দেবার শক্তি কারো নেই; প্রণীত হওয়ার পর তাকে বাতিল ঘোষণা করা যায় মাত্র।

আইন যদি এমনভাবে প্রণীত হয়ে থাকে যে, তার এক অংশ থেকে অন্য অংশ বিচ্ছিন্ন করা যায় না তবে সেক্ষেত্রে সমস্ত আইনটি বাতিল ঘোষিত হবে। আইনের অসমঞ্জস অংশ বাতিল ঘোষণা করলে যদি আইনটির অন্যান্য অংশ অকার্যকর না হয় তবে অসমঞ্জস অংশটুকুই বাতিল ঘোষণা হবে।

ইতিপূর্বে প্রচলিত আইনানুযায়ী যদি কোন সম্পত্তির উপর কারো অধিকার জন্মে থাকে, যদি কারো অধিকার বিনষ্ট বা খর্ব হয়ে থাকে, যদি কারো দন্ড বা শাস্তি হয়ে থাকে তা সংবিধানের

www.pathagar.com

বিধানের সাথে অসমঞ্জস হলেও নাকচ হবে না কারণ সংবিধানের এই ভাগে প্রণীত বিধানাবলীর অতীত প্রয়োগ নেই।

এই অনুচ্ছেদের তৃতীয় দফা সংবিধান (২য় সংশোধন) আইন ১৯৭৩ দ্বারা এই অনুচ্ছেদে সংযোজিত হয়েছে। সংবিধান (২য় সংশোধন) আইন ১৯৭৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে বলবৎ হয়েছে। কিন্তু বর্তমান অনুচ্ছেদ অর্থাৎ ২৬ অনুচ্ছেদ এবং ১৪২ অনুচ্ছেদ কার্যকরী হয় ১৫ই জুলাই থেকে। ঐ তারিখে সংবিধান (১ম সংশোধন) আইন ১৯৭৩ বলবৎ হয়। সেকারণে ঐ তারিখ থেকে এই দুটি ধারা বলবৎ গণ্য করার বিধান প্রদত্ত হয়েছে।

এই দফায় বলা হয়েছে যে, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদ দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় যেকোন আইন প্রণয়ন করে ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তন করতে পারবেন।

১৪২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সংসদ আইনের দ্বারা সংবিধান সংশোধন করতে পারবেন। সুতরাং সংবিধান সংশোধন করতে হলে আইনের প্রয়োজন পড়বে। বর্তমান অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করা যাবে না এবং করলে তা বাতিল হবে। পুরাতন ১৪২ অনুচ্ছেদের সাথে পুরাতন ২৬ অনুচ্ছেদ একত্রে পড়লে দেখা যায় যে, মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী আইন দ্বারা সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা সংসদের নেই। ২৬ অনুচ্ছেদের তৃতীয় দফা এবং ১৪২ অনুচ্ছেদে সংযোজিত অনুরূপ দফা সংসদের এই অক্ষমতা দূর করেছে। মৌলিক অধিকারের সাথে অসমঞ্জস আইন দ্বারা সংবিধান সংশোধন করার পথে সংসদের এখন আর বাধা নেই।

সংবিধানের ৩৩ এবং ৪৭ অনুচ্ছেদে কতিপয় নতুন বিধান সংযোজিত হয়েছে। এই নতুন বিধান দ্বারা নিবর্তনমূলক আটকের এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধানে একটি নতুন ভাগ অর্থাৎ নবম – (ক) ভাগ সংযোজিত হয়েছে। এবং তাতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সংবিধানের নবম (ক) ভাগে জরুরী অবস্থা ঘোষণা, জরুরী অবস্থার সময় সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের বিধান স্থগিতকরণ এবং মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত করণের বিধান রয়েছে। ২৬ অনুচ্ছেদের তৃতীয় দফা এবং ১৪২ অনুচ্ছেদে নব সংযোজিত অনুরূপ ২য় দফা বর্তমান না থাকলে এরূপ বলা যেতো যে, ৩৩ এবং ৪৭ অনুচ্ছেদের এবং নবম (ক) ভাগের সংযোজন। মৌলিক অধিকার পরিপন্থী বিধায়, সংবিধান বহির্ভূত হয়েছে। বর্তমানে আর সেরূপ বলা যাবে না।

সংবিধান সাধারণ আইনের উর্ধ্বে। সুতরাং এর সংশোধন সাধারণভাবে হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আইন বলে এটা চিরস্থায়ী দলিল নয় এবং তা চিরকাল একস্থানে অনড় হয়ে বসে থাকতে পারে না। দেশের অবস্থা বদলায়, প্রয়োজনে পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে আইন পরিবর্তন হয়। সুতরাং সময়ে সময়ে সংবিধান সংশোধন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

মৌলিক অধিকারের নিরাপত্তা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত তবে দুষ্পরিবর্তনীয় নয়। প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করা যায়। সংশোধনের বিধান সংবিধানে রয়েছে।

www.pathagar.com

সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারের বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। এই মৌলিক অধিকারগুলো দেশের সাধারণ আইন ও সংবিধানের অপরাপর বিধান থেকে একটু ভিন্ন মর্যাদা পায়। সাধারণ আইন প্রণয়ন, সংশোধন, রদ ও বাতিলের প্রক্রিয়ায় সংবিধানের বিধি প্রণয়ন, সংশোধন, রদ বা বাতিল করা যায় না। এজন্য ভিন্ন ব্যবস্থা নিতে হয়। সংবিধান সংশোধনের স্বাভাবিক ধারায় মৌলিক অধিকার সংশোধন করা যায় না। মৌলিক অধিকার রদবদল করতে হলে সংবিধানই পরিবর্তন করতে হয়। তাই মৌলিক অধিকারের নিরাপত্তা অনেক বেশী।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে আইনসভা সংবিধান প্রণয়ন করেছে, প্রয়োজনে সংশোধন করে এবং করবে। কিন্তু আইনসভা বা সংসদ মৌলিক অধিকার পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে না। তাই মৌলিক অধিকারের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত।

আলোচ্য অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা প্রদান করা হলো। অষ্টম সংশোধনীর উপর একটি কেসে বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, সংসদ সংবিধানকে এমনভাবে সংশোধন করতে পারেন না যাতে রাষ্ট্রের মূল কাঠামো পরিবর্তন হয়।

অনুচ্ছেদঃ ২৭

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

ভাষ্য

এই মৌলিক অধিকারটি পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানের ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকাররূপে বিধৃত ছিল। ভারতের সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে এই অধিকারটি বর্ণিত আছে।

সকল নাগরিক বা মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সমান, এই মৌলিক অধিকারটি শুধু এই উপ-মহাদেশে নয়, বরং ইউরোপ এবং আমেরিকার সংবিধানেও তা বিদ্যমান। শুধু বর্তমান যুগে নয়, আদিকালেও এই অধিকার স্বীকৃত ছিল। খ্রীস্টের জন্মের আগে দার্শনিক সিসেরো বলেছিলেন, 'সকল মানুষ সমান'। জাস্টিনিয়ানের ইনস্টিটিউটে ৫২৯ খ্রীস্টাব্দে বলা হয়েছিল, স্বাভাবিক অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। মধ্যযুগে ধর্মগুরুগণ বলতেন, "When Adam delved and Eve Span, where was then gentleman. আলকোরআনে বলা হয়েছে, "সকল মানুষ এক সম্প্রদায়ভুক্ত"।

এই অনুচ্ছেদের প্রথম অংশে বলা হয়েছে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, সমতার অধিকার শুধু নাগরিকদের জন্য। অর্থাৎ সংবিধানে শুধু নাগরিকদের জন্য সমতার বিধান করা হয়েছে। যারা নাগরিক কেবল তারাই আইনের দৃষ্টিতে সমতার দাবী করতে পারেন। বাংলাদেশে তিন ধরনের মানুষ বাস করে ঃ ১. বাংলাদেশী, ২. বিদেশী, ৩. রাষ্ট্রহীন। যারা বিদেশী বা রাষ্ট্রহীন তাদের জন্য এই অধিকার নেই। পাকিস্তানের মানুষ বা ভারতের মানুষ বাংলাদেশে বাংলাদেশীর সাথে সমতার দাবী করতে পারেন না। সমতার অধিকার দেয়া হয়েছে

www.pathagar.com

শুধু আইনের দৃষ্টিতে। আইনের বাইরে অন্য কোন দৃষ্টিকোণ দ্বারা মানুষের সমতার অধিকার এই অনুচ্ছেদ নিশ্চিত করে নাই। ধর্মীয় বা সামাজিক কারণে অন্যকোন ক্ষেত্রে অসমতা বা ভেদাভেদ দূরীভূত করতে এই অনুচ্ছেদ কার্যকর নয়।

এবার সমতার অধিকার নিয়ে আলোচনা করা যাক।

বয়স, যোগ্যতা, দক্ষতা, মেধা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষ সকলে সমান নয়; তবে গুণ ও পেশাগত পরিচয়ের উর্ধ্বে মানুষের একটি মানবিক সত্তা আছে। এই মানবিক সত্তার পর্যায়ে সকল মানুষ সমান বা সকল নাগরিক সমান।

দেশের বেশীর ভাগ আইন সকল নাগরিককে স্পর্শ করে। কারণ এসব আইন সকল নাগরিকের কল্যাণের জন্য, নিয়ন্ত্রণের জন্য। এসব ক্ষেত্রে সকল নাগরিক সমান গণ্য হবে। বাংলাদেশের দন্ডবিধি, ফৌজদারী কার্যবিধি, সাক্ষ্য-আইন প্রভৃতি সকল মানুষকে স্পর্শ করে। তাই এসব ক্ষেত্রে অসমতামূলক বিধান মৌলিক-অধিকার পরিপন্থী।

তবে এ নীতির কিছু সর্বজনগৃহীত ব্যতিক্রম আছে। যেমনঃ

(ক) রাষ্ট্রপতি সেই ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি তার কার্যভারকালে তাঁর বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রকার ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু করা যাবে না, এবং তাকে গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত থেকে কোন পরোয়ানা জারি করা যাবে না।

(খ) বিদেশী রাজা বা রাষ্ট্রদূত আমাদের আদালতে জবাবদিহী করতে বাধ্য নন।

(গ) সংবিধানের ৪৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "মুক্তিসংগ্রামের সময় মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে বা দেশের শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে কোন ব্যক্তি যদি এমন কাজ করে থাকেন যার জন্য তার উপর দায় বর্তায়, সেক্ষেত্রে আইনের দ্বারা তাদের দায়মুক্ত করা যাবে।

দুঃখের বিষয়, সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত স্বতঃ ও সদা উচ্চারিত এই মহৎ সত্যটি আজও পৃথিবীর বুকে সম্যক প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা পায়নি। সাদা-কালো, ভদ্রলোক- চাষার দ্বন্দ্ব বিভেদ আজো সমাজ-মানসকে কলুষিত করছে।

সকলের জন্য যে আইন তা সমভাবে সকলের উপর প্রযোজ্য। কিন্তু সকল আইন সকলের জন্য নয়। যারা মোটর গাড়ীর মালিক তাদেরকে পথকর দিতে হয়। এখানে পথকরের আইন সকলের উপর সমভাবে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং আইনের জন্য নাগরিকদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। সকল মানুষই এক—একথা সংবিধান বলেনি। বলেছে যারা এক তারা সমান।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কারা এক? মানবিক দিক থেকে সকল মানুষ এক। কিন্তু পেশাগত, ধর্মগত ও স্থানগতভাবে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা এসে যায়। এই বিভিন্নতার নিরিখে শ্রেণী চিহ্নিত হতে পারে। পেশাগতভাবে শ্রেণী চিহ্নিতকরণের একটি উদাহরণ ডাক্তারী পেশা। যারা সরকারী চাকুরি করেন তাঁরা অন্যকোন চাকুরি বা ব্যবসায় নিয়োজিত হতে পারেন না। কিন্তু ডাক্তার বাইরে প্রাক্‌টিস করতে পারেন, তাদের বেলায় এই আইন ব্যতিক্রম।

ধর্মগতভাবে এই উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক আইন প্রচলিত আছে। ক্রমান্বয়ে পার্থক্য সংকুচিত হচ্ছে। বর্তমানে উত্তরাধিকার, বিবাহ, তালাক, দত্তক, উইল, দান, ওয়াকফ এবং দেবোত্তর এই কয়েকটা বিষয়ে সীমিত হয়েছে। অধুনা মেয়েরা দাবী তুলছেন

www.pathagar.com

যে, সাংবিধানিক সমতার অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তাদেরকে সমানাধিকার দিতে হবে।

স্থানগতভাবেও শ্রেণীবিভাগ হতে পারে। আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য ভিন্ন আইন প্রচলিত ছিল। এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে।

রাষ্ট্রের নীতি কার্যকর করার জন্য শ্রেণীবিভাগ করা যায়। উদাহরণ দেয়া যাক। জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি সার্থক করার জন্য আইন করা হল। পুরুষদের ২১ আর মেয়েদের ১৮ বছর বয়স না হলে বিয়ে করতে পারবে না। এখানে বিয়ে করবার অধিকারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাগরিকদের বয়সের নিরীখে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১. ২১ উর্ধ্ব পুরুষ, ২. অনূর্ধ্ব ২১ পুরুষ, ৩. ১৮ উর্ধ্ব স্ত্রীলোক, ৪. অনূর্ধ্ব ১৮ স্ত্রী লোক। এই জাতীয় শ্রেণী বিভাগ যুক্তিসঙ্গত এবং তা সমতার নীতির পরিপন্থী নয়। সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রেও তেমনি শ্রেণী বিভাগ করা হয়। যেমন ২১ বছরের কম বয়সের কোন নাগরিক সরকারী চাকুরী পাবে না আবার ৫৭ বছর অতিক্রান্ত হলে আর চাকুরিতে থাকতে পারবে না।

শ্রেণীবিভাগ কি যুক্তিযুক্ত তা বিচার করার সময় দুটি বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। (১) যে উদ্দেশ্যে শ্রেণীবিভাগ করা হচ্ছে তা যুক্তিসঙ্গত এবং আবশ্যক কিনা। (২) শ্রেণী বিভাগের জন্য যে বৈশিষ্ট্য বেছে নেয়া হয়েছে তা যুক্তিসঙ্গত কিনা।

অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, সকল নাগরিক আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। এই বাক্যটি দুই প্রকার অর্থ বহন করে। একটি না-বাচক এবং অন্যটি হ্যাঁ- বাচক।

না-বাচক অর্থের ধারণাটি এই যে, আইনের প্রয়োগের ব্যাপারে সকলেই সমকক্ষ বা সমান হবে। কেউ কোন বিশেষ সুবিধা পাবে না। এই অভিব্যক্তিটির দাবী এই যে, সকল নাগরিককে আইন প্রয়োগের ব্যাপারে একইভাবে দেখতে হবে। কেউ কোন বিশেষ সুবিধা পাবে না বা অসুবিধায় পড়বে না। যেখানে চুরির শাস্তি হাতকাটা, সেখানে খলিফার পুত্র চুরির দায়ে অভিযুক্ত হলে তার হাত কাটা যাবে। নির্ধারিত গতিবেগের চাইতে বেশী গতিতে গাড়ী চালালে প্রিন্সকেও জরিমানা দিতে হবে।

এই নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সামান্য ব্যতিক্রম আছে। যেমন কোন বৃহৎ পরিকল্পনা একযোগে সারা দেশের সর্বত্র শুরু করা যায় না। একটি জায়গা থেকে শুরু করতে হয়। যেখান থেকে শুরু করা হয় সেখানকার মানুষ হয়তো আগে সুফল ভোগ করবে। অপেক্ষাকৃত বিলম্বে যেখান থেকে শুরু হয় সেখানকার মানুষ পরিকল্পনার সুফলও বিলম্বে পায়। এটা অবৈধ নয়। যেমন বাংলাদেশে বর্তমানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় প্রতিটি জেলা থেকে একটি থানাকে নির্বাচন করা হয়েছে। অন্যান্য থানার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়েছে —বলা যাবে না; কারণ একসাথে সবগুলোতে চালু সম্ভব নয়। অতএব প্রাথমিকভাবে কোন না কোন একটাকে তো বেছে নিতেই হবে। বৈধ বৈষম্যের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৭ ধারায়। এই ধারায় বলা হয়েছে যে, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী তাদের কর্তব্য পালনকালে যদি এমন কাজ করে ফেলেন, যা অপরাধের পর্যায়ে পড়তে পারে তাহলে সেই অপরাধের বিষয়ে অভিযোগ করতে হলে সরকারের পূর্বানুমতি প্রয়োজন। সরকারী কর্মচারীও নাগরিক। অন্য নাগরিক অপরাধ করলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে

www.pathagar.com

সরকারের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হয় না, সরকারী কর্মচারীর বেলায় পূর্বানুমতি কেন লাগবে? এটা কি একটি বৈষম্য নয়? উপমহাদেশের উচ্চ আদালত এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, সরকারী কর্মচারীগণকে কিছু নিরাপত্তা না দিলে তারা সঠিকভাবে তাদের কর্তব্য পালন করতে পারবেন না, তাই ফৌজদারী কার্যবিধি ১৯৭ ধারা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী নয়।

হ্যাঁ-বাচক দিকটি হচ্ছে, বাংলাদেশের সকল নাগরিক আইনের সমান আশ্রয় পাবে। ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলিম সকলেই আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

বিনীতভাবে নিবেদন করছি যে, এই মৌলিক অধিকারটি এখনো একটি প্রত্যাশা। যে দরিদ্র, যে অশিক্ষিত সে আইনের আশ্রয় পায় কি? সমান আশ্রয় তো দূরের কথা, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থ বধূদের নির্মমভাবে প্রহৃত হতে দেখেছি। আইনের আশ্রয় লাভের কোন উপায় এবং সাহসই তাদের নেই।

এই অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকার

এই মৌলিক অধিকারটির সাথে মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ ৭-এর সামঞ্জস্য রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ আইনের সম্মুখে সকলেই সমান। এবং কোনরূপ ভেদাভেদ ব্যতীত সকলেই সমভাবে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী।

অনুচ্ছেদঃ ২৮

(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম-গোষ্ঠী-বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিকের কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

ভাষ্য

সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে চারটি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এই চারটি অধিকার চারটি দফায় বিধৃত।

প্রথম দফায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না কোন নাগরিকের প্রতি কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী, পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে। সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র বলতে সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত। এই দফায় সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে বৈষম্য প্রদর্শন করতে। বৈষম্য

www.pathagar.com

বলতে ভিন্ন রকম আচরণ বুঝায়। কিছু দেবার বা নেয়ার ব্যাপারে একজনের সঙ্গে একরকম আচরণ আর অন্যজনের সঙ্গে অন্যরকম আচরণ—একেই বলে বৈষম্য।নাগরিকদের যেসব অধিকার আছে সেগুলো পূরণের ব্যাপারে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পৌর অধিকার। নাগরিক তার বৈধ অধিকার ভোগ করবেন। এসব অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। এই দফায় নাগরিকদের প্রতি তাদের অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বৈষম্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ হয়েছে।

পাঁচটি কারণে বৈষম্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ধর্ম। ধর্মের কারণে কোন নাগরিককে বিশেষ কোন অনুগ্রহ বা নিগ্রহ প্রদর্শন করা যাবে না, কোনভাবে উপকৃত বা বঞ্চিত করা যাবে না। আইন প্রণয়নকালে কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের ছাড় দেয়া এবং কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বীকে কঠোরতা আরোপ করা যাবে না। একই কারণে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন সংবিধান বহির্ভূত।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর বিভিন্নতা আমাদের দেশে বিরল। চাকমা, মগ, কুকি, মনিপুরি, সাঁওতাল, খাসিয়া প্রভৃতিকে বোধ হয় উপজাতীয় গোষ্ঠী বলা যেতে পারে। এদের প্রতি বৈষম্য নিষিদ্ধ।

তৃতীয় কারণ হচ্ছে বর্ণ। বর্ণবিভেদ আমাদের দেশে প্রবল নয়। হিন্দুদের মধ্যে একসময় চার বর্ণ ছিল। পরবর্তীকালে তারা বহু জাতিতে পরিণত হয়। বর্তমানে এই বিভিন্নতা ক্ষীয়মান। মুসলমানদের মধ্যে নীল রক্তের দাবী দেখা যায় বটে; কিন্তু তা খুবই দুর্বল। বর্ণের কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধ।

চতুর্থ কারণ হচ্ছে নারী-পুরুষ ভেদ। মহিলাদের পুলিশে চাকুরি দেয়া হবে না এ প্রকার আদেশ সংবিধান বহির্ভূত। লিঙ্গভেদে বৈষম্য প্রদর্শন সংবিধানে নিষিদ্ধ।

পঞ্চম কারণ হচ্ছে জন্মস্থান। উত্তর বঙ্গের মানুষ দক্ষিণবঙ্গে ব্যবসা করতে পারবে না-এ প্রকার বিধান সংবিধান বহির্ভূত। তবে জন্মস্থান এবং বাসস্থান এক নহে। বাসস্থানের কারণে বৈষম্য সিদ্ধ।

দ্বিতীয় দফায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার পাবেন। প্রথম দফা বৈষম্যবিরোধী আর দ্বিতীয় দফা অধিকার-প্রদায়ী। এই দফার প্রতিপাদ্য বিষয় নারী সমান অধিকার পাবে পুরুষের সাথে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বত্র। রাষ্ট্রীয় অধিকারের মধ্যে রয়েছে ভোটাধিকার ও চাকুরির অধিকার। গণঅধিকারের মধ্যে আসে ব্যক্তিস্বাধীনতা, পরিবার ও সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকার। ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে জীবনরক্ষা, বাক, ধর্ম, আইনের সমতা, ন্যায়বিচার, সমানসুযোগ, সংঘ গঠন, পেশা, গ্রেফতার ও কয়েদের ব্যাপারে রক্ষাকবচ ইত্যাদি সম্পর্কিত স্বাধীনতা। পরিবার সম্পর্কীয় অধিকারের মধ্যে আছে বিবাহ, সন্তান এবং অভিভাবক সম্পর্কীয় স্বাধীনতা। এসব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার পাবেন। নারী-পুরুষের শক্তি, মেধা ও মেজাজের তারতম্য আছে কিনা সে প্রশ্নে যাওয়ার অধিকার সংবিধান রাখেনি।

নারী-পুরুষ সমান কিন্তু এক নয়। বাংলাদেশের আইনের বহু জায়গায় একথার স্বীকৃতি

www.pathagar.com

আছে। বাড়ীর পুরুষের উপর সমনজারি করলে দেওয়ানী কার্যবিধির ৫ আদেশের ১৫ নিয়মে সকলের উপর জারি করা হয়। দন্ডবিধিতে ক্ষেত্রবিশেষে স্ত্রীর দখলকে স্বামীর দখল গণ্য করা হয়। বিয়ের বয়সের ব্যাপারে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে তারতম্য আছে। এসব বিভিন্নতা অবৈধ নয়।

তৃ দফায় বলা হয়েছে, জনসাধারণের কোন বিশ্রাম বা বিনোদনের স্থানে প্রবেশের কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা বাসস্থানের কারণে কোন বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।

জনসাধারণের বিনোদনের স্থান বলতে বুঝায় সিনেমা হল, রঙ্গমঞ্চ, সার্কাস, খেলার মাঠ, আর্ট গ্যালারী, মেলা, স্টেডিয়াম, ক্লাব ইত্যাদি। বিশ্রামের স্থান বলতে বুঝায় পার্ক, উদ্যান, ময়দান প্রভৃতি। অবশ্য ব্যক্তিগত জলসাঘর বা নাচঘরে নিষেধাজ্ঞা এই বারণের মধ্যে পড়ে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলতে সরকারী-বেসরকারী সকল ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বুঝায়। ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী, পুরুষ ও বাসস্থান এই পাঁচ কারণে কোন বৈষম্য প্রদর্শন হবে না। এর বাহিরে অন্য কোন কারণে বৈষম্য প্রদর্শন এই মৌলিক অধিকার-পরিপন্থী নয়।

চতুর্থ দফায় নির্দেশ করছে

(ক) নারী, শিশু ও দেশের অনগ্রসর সম্প্রদায়ের এই অনগ্রসর তিন শ্রেণীর মানুষের অবস্থান পরিস্থিতিগতভাবে এবং সম্ভবতঃ প্রকৃতিগতভাবে, কিঞ্চিত নিম্ন পর্যায়ের। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের যে অবস্থান এদের অবস্থান তার নিম্নে।

(খ) নারী, শিশু ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের এই অবস্থানগত নিম্নত্বের কারণ সহজেই অনুমেয়। বয়সের হ্রস্বতার এবং লেখাপড়ায় পশ্চাৎপদতার জন্য এই অবস্থা।

এই পরিস্থিতিতে সংবিধান নির্দেশ দিচ্ছে যে, বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়ে এই নিম্নতর পর্যায়ের তিনটি শ্রেণীকে অন্য সকলের সাথে সমান করতে হবে। বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান আপাতদৃষ্টিতে বৈষম্যমূলক মনে হলেও এগুলোর চূড়ান্ত লক্ষ্য সমতা আনয়ন। বিশেষ বিধান প্রণয়ন অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্র এদের জন্য সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করতে পারবে। এই সংরক্ষণ নীতি যুক্তিসংগত ও অপরিহার্য হলে তা সমতার নীতির পরিপন্থী নয়।

অনুচ্ছেদঃ ২৯

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই- (ক) নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে,

www.pathagar.com

(খ) কোন ধর্মীয় বা উপসম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান সংবলিত যেকোন আইন কার্যকর করা হইতে,

(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যেকোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

ভাষ্য

সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের প্রথম দফায় বলা হয়েছে যে, সকল নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে অর্থাৎ বাংলাদেশের সরকারী কর্মে নিয়োগ লাভ করবার ক্ষেত্রে বা সরকারী পদ লাভ করবার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাবে। এর মর্মার্থ হচ্ছে যোগ্যতাই হবে নিয়োগ বা পদোন্নতি লাভের একমাত্র মাপকাঠি। প্রজাতন্ত্রের কর্ম বলতে অসামরিক বা সামরিক বাংলাদেশ সরকার সংক্রান্ত যেকোন কর্ম, চাকুরি বা পদ বুঝায়। এছাড়া আইন যাকে প্রজাতন্ত্রের কর্ম বলে ঘোষণা করে তাও এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব এই মৌলিক অধিকার বলে সামরিক অসামরিক এবং অন্যান্য সরকারী চাকুরিতে সমতার নীতি অনুসৃত হবে।

এই সমতার অধিকারের দাবী একমাত্র বাংলাদেশের নাগরিকের। যারা বিদেশী তারা এই অধিকার দাবী করতে পারেন না। তবে বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশী এই অধিকার দাবী করতে পারেন। একজন দক্ষ ইংরেজ বা একজন সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ ভারতীয় নাগরিক এই অভিযোগ করতে পারেন না যে, তাদের দাবীকে উপেক্ষা করে একজন বাংলাদেশীকে সরকারী চাকুরি দেয়া হয়েছে।

এই অধিকারের ব্যাপ্তি অনেক। বাংলাদেশের সবচাইতে বড় সম্পদ হচ্ছে এর জনশক্তি। এই জনশক্তির কর্মশক্তি ব্যবহৃত হওয়ার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে সরকারী চাকুরি। অন্যদিকে সরকারী চাকুরির পদ সৃষ্টি করা হয়েছে দেশকে সুপরিচালন –এর জন্য; উপযুক্ত সেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী কর্মচারীগণ অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মে লিপ্ত। তাদের ভ্রান্তি বা অবহেলা দেশকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি যে কর্মের জন্য অনুপযুক্ত সে কর্মে তাকে নিয়োগ করলে বা সঠিক গুণাগুণের ভিত্তি বিবেচনা না করে তাকে কর্মে নিয়োগ করলে দেশের জন্য মহা অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে। এ জাতীয় নিয়োগের প্রতিক্রিয়া বছরের পর বছর চলতে থাকে। একজন নিম্নমানের অলস লোককে চাকুরি দিলে সমগ্র দেশ তার কুফল ভোগ করে। বলা বাহুল্য, চাকুরি থেকে অপসারণ খুব কঠিন কাজ।

নিয়োগ এবং পদলাভ এই অধিকারের আওতাভুক্ত এবং সে কারণে সরকারী কাজের প্রতিস্তরে এর প্রয়োগ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সুযোগের সমতার এই অধিকার চাকুরিতে নিয়োগ বা পদলাভের প্রাক্কাল থেকে চাকুরি সমাপ্তির উত্তরকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। চাকুরি নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহবান, চাকুরির শর্তাবলী নির্ধারণ, বেতন নির্ধারণ, বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতি, চাকুরির বয়সসীমা, পেনশন, অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা–প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে এই সমতার অধিকার দাবী করা যায়। এই স্তরগুলোর কোন একটিতে যদি সমতার সুযোগ অস্বীকার করে কোন রুল বা বিধি প্রণয়ন ও জারি করা হয় তবে সেই রুল বা বিধি সংবিধান বহির্ভূত বলে গণ্য হবে। সংবিধানের ১৩৩ থেকে ১৩৬ অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে আরও কিছু বিধান বিধৃত। এ

www.pathagar.com

বিষয়ে সকল প্রকার বিধি বিধান সরকার প্রণয়ন করতে পারেন, কিন্তু কোন বিধান সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হতে পারবে না।

এ ব্যাপারে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, সকল কাজের প্রকৃতি এক রকম নয়। যে কাজের প্রকৃতি যে রকম সে কাজের প্রকৃতি অনুসারে সেরকম যোগ্যতা চাই। যারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পদের প্রার্থী তাদের নিকট স্নাতকোত্তর ডিগ্রী চাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যারা প্রশাসনে চাকুরি চাইছেন তাদের জন্য স্নাতক পর্যায়ের ডিগ্রী যথেষ্ট বিবেচনা করা যেতে পারে। চল্লিশের দশকের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। তখন সার্কেল অফিসারের চাকুরিতে তফসীলভুক্ত হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক কোটা ছিল। সেই কোটাতে তারা চাকুরি পাচ্ছিল। তখন একটি অভিযোগ শুনা যায় যে, কোটার কারণে চাকুরির মান নেমে যাচ্ছে। খুব ভাল উচ্চ বর্ণের হিন্দু পরিবারের ছেলেরা সাম্প্রদায়িক কোটার কারণে সার্কেল অফিসারের চাকুরি পাচ্ছে না। এ সময় শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। এতে তিনি খুব জোরের সঙ্গেই বলেন যে, চাকুরির প্রকৃতির সঙ্গে দক্ষতার প্রকৃতি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা আবশ্যক। এবং সে আবশ্যকটি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, তফসীলভুক্ত হিন্দু ও মুসলমান কৃষকের ছেলেরা হিন্দু ভদ্রলোকদের ছেলেদের তুলনায় অনেক দক্ষ। সার্কেল অফিসারের কাজে শেক্সপিয়ার বা শেলীর কবিতার মর্ম উদ্ধার করা জরুরী নয়। বরং জরুরী হচ্ছে গ্রাম বাংলার মাঠ-ঘাট সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জ্ঞান।

সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ অবৈধ নয়। শ্রেণীবিভাগ করতে হলে এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর বিভিন্নতা এসে যায়। এই বিভিন্নতাও অসিদ্ধ নয়। নিয়োগ, পদোন্নতি, বেতন, প্রান্তিক সুবিধা, অবসর, পেনশন প্রভৃতির ব্যাপারে শ্রেণী বিভাগ বা বিভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু একই কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্য অবৈধ। আরেক কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ যুক্তিযুক্ত হতে হবে।

এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় দফা অনুসারে, সরকারী কাজে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি অযোগ্যতা আরোপ বা বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে স্বাভাবিক বৈষম্যহীনতা বিরাজমান। এখানে ভাষা, ধর্ম, অঞ্চল ইত্যাদির ভেদাভেদ নাই বললেই চলে। তবু সংবিধান এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হোক সরকারী চাকুরি লাভের ব্যাপারে ধর্ম বা লিঙ্গের বা অন্য কোন কারণে বৈষম্য দেখালে তা অবৈধ হবে। প্রসঙ্গতঃ জেনে রাখা প্রয়োজন যে, বৈষম্যহীনতার অধিকার, নিয়োগ লাভের সমতার অধিকার এবং চাকুরি প্রাপ্তির অধিকার এক নয়। এই অধিকারগুলো সকল যোগ্য ও দক্ষ প্রার্থীর চাকুরির নিশ্চয়তা দিতে পারে না। যেখানে শূন্যপদের সংখ্যা দশ আর যোগ্যপ্রার্থীর সংখ্যা শতাধিক সেখানে ঐ শতাধিক যোগ্য প্রার্থী থেকে দশজনকে বেছে নেয়ার অধিকার কর্তৃপক্ষকে দিতেই হবে। এই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ, জন্মস্থান ইত্যাদিকে নিয়োগ কর্তৃপক্ষ বিবেচনায় আনবেন না — এটাই সংবিধানের নির্দেশ। তারা যদি এসব বিষয় বিবেচনার মধ্যে এনেই ফেলেন এবং তা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে নিয়োগ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

www.pathagar.com

এই অনুচ্ছেদের তৃতীয় দফায় রয়েছে তিনটি উপদফা। প্রথম উপদফায় বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের অনগ্রসর অংশকে সরকারী কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার জন্য তাহাদের অনুকূলে রাষ্ট্র বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারবে। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সকল মানুষ সমানভাবে অগ্রসর নয়। যারা অনগ্রসর তারা সরকারী চাকরি পান না। ফলে সরকারী চাকুরিতে তাদের প্রায়ই দেখা যায় না। রাষ্ট্র তাদের জন্য কোটার ব্যবস্থা সংরক্ষণ করতে পারে। মেয়েদের জন্য কোটা, উপজাতিদের জন্য কোটা, এ জাতীয় সংরক্ষণ বৈষম্য নয়। শিক্ষাগতভাবে, অঞ্চলগতভাবে, অর্থগতভাবে বাংলাদেশের মানুষ যারা অনগ্রসর তারা অনগ্রসরতার কারণে সরকারী চাকরি পায় না। তাদের অগ্রসর করার জন্য বা টেনে তুলার জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা সংবিধানবিরোধী হবে না।

জীবনযুদ্ধে দীর্ঘকাল দৌড়াতে দৌড়াতে যারা ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছে, অচতুর ও স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠা সম্ভব নয়। তাই প্রতিযোগিতার সময় পিছিয়ে পড়া স্বাভাবিক মানুষদের কিছুটা বাড়তি সুবিধা দিলে তারা সমতায় আসতে পারে। তবে এই কোটা বরাদ্দ বা সুবিধা দেয়ার সময় মূলনীতি থেকে সরে গেলে তা অবৈধ হবে। মূলনীতি হচ্ছে সমতা আর কোটা বরাদ্দের ব্যবস্থা হচ্ছে একটি ব্যতিক্রম। সমতার মূলনীতিটি একেবারে বিসর্জন দিয়ে ব্যতিক্রম ব্যবস্থা অবলম্বন করা সিদ্ধ নয়। সরকারী কর্মে দক্ষতা নষ্ট হয়ে যায় এমন আইন ও নিয়ম অবৈধ। এই উপমহাদেশের উচ্চ আদালত বলেছে যে, শতকরা ৫০ ভাগের বেশী পদ রিজার্ভ করা সংগত নয়। অবশ্য এই অনুচ্ছেদের এই উপদফা কারা অনগ্রসর তা নির্ধারণ করে দেয়নি। এটা নির্ধারণের ভার সংবিধান সরকারের উপর ন্যস্ত করেছে।

দ্বিতীয় উপদফায় বলা হয়েছে, ধর্মীয় বা উপসম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে নিজ নিজ ধর্মানুসারী ও উপসম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণ করা যাবে। বাংলাদেশে ইসলামী ফাউন্ডেশন, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট বা বৌদ্ধ ফাউন্ডেশন রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান সরকারী অর্থে পরিচালিত হলেও এসব প্রতিষ্ঠান সম্প্রদায়ভুক্ত বা সম্প্রদায়ভিত্তিক। তাই এসবে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত বাধানিষেধ আরোপ করা সংবিধানের পরিপন্থী নয়।

এই অনুচ্ছেদের শেষ উপদফায় বলা হয়েছে যে, কর্মের প্রকৃতি বিবেচনা করে তদুপযোগী পদ পুরুষ ও নারীর জন্য সংরক্ষণ করা যাবে। আমরা দেখেছি যে, নারী-পুরুষ ভেদে রাষ্ট্র কোন বৈষম্য প্রদর্শন করতে পারবে না। এবং রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার পাবে এবং নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। কিন্তু এই উপদফায় বলা হয়েছে প্রকৃতিগতভাবে এবং উপযোগিতার কারণে নারী-পুরুষের জন্য পদ সংরক্ষণ বৈধ। গর্ভবতী মায়েদের প্রসব কর্মের জন্য সহায়তাকারী নারী ধাত্রীই নিঃসন্দেহে উপযোগী। ঐ কর্মে পুরুষ সেবক বা সহায়ক উপযোগী নয়। তাই এই কাজ শুধু নারীর জন্য সংরক্ষণ করা যায়।

এই অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকার

এই মৌলিক অধিকারটির সাথে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের

www.pathagar.com

(২) পরিচ্ছেদের সামঞ্জস্য আছে। এতে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক ব্যক্তির তার দেশের সরকারী কর্মে প্রবেশের সমানাধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদঃ ৩০

(১) রাষ্ট্র কোন উপাধি, সম্মান বা ভূষণ প্রদান করিবেন না।

(২) রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন উপাধি, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না।

(৩) সাহসিকতার জন্য পুরস্কার কিংবা আকাদেমীয় বিশিষ্টতা দান হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

ভাষ্য

এই অনুচ্ছেদের প্রথম দফায় রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকার উপাধি, সম্মান বা ভূষণ প্রদান করতে নিষেধ করা হয়েছে। নাগরিকগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক সমতা আনয়ন করবার জন্য এই বিধানের প্রবর্তন করা হয়েছে। রাষ্ট্র মানুষে মানুষে তফাৎ করবে না। উপাধি, সম্মান বা ভূষণ দিয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে না। এটাই এই বিধানের লক্ষ্য। এই বিধানের কিছু ব্যতিক্রম আছে যা তৃতীয় দফায় বর্ণিত হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা রাষ্ট্রের উপর প্রযোজ্য, অন্য সংস্থার উপর প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয় দফায় বাংলাদেশের নাগরিককে বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট থেকে উপাধি, সম্মান পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন নিয়ে নাগরিকগণ তা গ্রহণ করতে পারেন। এই অনুচ্ছেদের তৃতীয় দফায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের জন্য নিষিদ্ধ হবে না সাহসিকতার জন্য পুরস্কার দেয়া এবং আকাদেমীয় বিশিষ্টতা প্রদান করা। অর্থাৎ সাহসিকতার জন্য পুরস্কার দেয়া এবং জ্ঞানগরিমার জন্য বিশিষ্টতা প্রদান করবার অধিকার রাষ্ট্রের আছে।

অনুচ্ছেদঃ ৩১

আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যেকোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

ভাষ্য

বাংলাদেশের সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে দুটি মৌলিক অধিকারের ঘোষণা বিদ্যমান। এর প্রথমটি হচ্ছে বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রত্যেক ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভ ও আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভের অধিকার। সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত ভাষা অত্যন্ত জোরালো। "আইনানুযায়ী এবং কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার" কথাগুলো অসাধারণ। 'আইনানুযায়ী' বললেই চলত কিন্তু সেখানেই ক্ষান্ত না হয়ে বলা হয়েছে 'কেবল

www.pathagar.com

আইনানুযায়ী'। শুধুমাত্র 'ব্যবহার লাভ করবে' না বলে বলা হয়েছে 'অবিচ্ছেদ্য অধিকার'। এই অধিকার লাভের জন্য বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া শর্ত নয়, বরং শর্ত হচ্ছে বাংলাদেশে অবস্থানকারী হওয়া, সে দেশীই হোক আর বিদেশীই হোক। আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ এবং আইনের আশ্রয় লাভের যে কথা এখানে বলা হয়েছে সেই আইন বলতে শুধু সংসদীয় আইন বা অধ্যাদেশই বুঝায় না; বিধি, প্রবিধান, বিজ্ঞপ্তি, প্রথা, উচ্চ আদালতের রায় তথা আইনের মর্যাদাবাহী সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে এসব কিছুই আইনের সীমার মধ্যে হওয়া চাই। আইনের নিয়ম বহির্ভূত কোন বিধি বিধান প্রথা পালনীয় নয়। এমন কি কোন বিধির মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগকে চরম ক্ষমতা প্রদানও বৈধ নয়।

সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রতিটি মানুষ আইনের আশ্রয় পাবে এবং আইন অনুযায়ী ব্যবহার লাভ করবে। সাধারণভাবে আমরা একে আইনের শাসন বলি।

এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে যে, আইনানুযায়ী ব্যতীত কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম এবং সম্পত্তির হানি ঘটানো যাবে না। এটা স্পষ্ট যে, পাঁচটি বিষয় মানুষের জন্য অতি মূল্যবান বলে সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে মানুষের জীবন,দেহ, স্বাধীনতা, সুনাম এবং সম্পত্তি।

জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী। সে যেন প্রবাহমান নদীর উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ। মুহূর্তে উদয় আবার মুহূর্তে বিলয়। লোকগীতির ভাষায়, 'চাবি মাইরা দিছে ছাইড়া', বা 'দম ফুরালে ফুস'। জীবন যত ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন, এটা সংবিধানের দৃষ্টিতে অতি পবিত্র।

স্বাধীনতাও মানব জীবনের জন্য অতি পবিত্র বিষয়। মানুষ জন্মে স্বাধীনভাবে, সুতরাং স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার একান্ত পবিত্র।

জীবন এবং স্বাধীনতার মত দেহও মানুষের অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। দৈহিক নিরাপত্তা ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের নিরাপত্তাই অর্থহীন। তাই দেহের নিরাপত্তা জীবনের জন্য খুবই মূল্যবান।

সুনাম মানবজীবনের অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ এক সম্পদ। জীবন এবং দেহের মতই মূল্যবান এটি। ব্যক্তির সুনাম নষ্ট হলে তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই মানব চরিত্রে কলংক লেপন ব্যক্তির জন্য এক মারাত্মক অভিশাপ।

আরেকটি মূল্যবান বিষয়ের কথা এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে সম্পত্তি। জীবন, দেহ, স্বাধীনতা, সুনাম ইত্যাদির মত সম্পত্তিও মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উপরে যে পাঁচটি বিষয়ের কথা বলা হল তা ব্যক্তির জন্য অতিমূল্যবান সম্পদ। এর কোন একটির উপরও আঘাত করা যাবে না। যদি না তা করার আইন থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি আইনবহির্ভূত কাজের কথা বলিঃ ১. স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কোন অভিযুক্ত বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে পুলিশের আঘাত করা, ২. কোন যুবক কর্তৃক গ্রামের প্রধানের ছোটবোনের সঙ্গে গোপনে কথা বলার অভিযোগে ঐ যুবককে কান ধরে উঠবস করানো। ৩. গরু চুরির অভিযোগে কোন দাগী আসামীর চক্ষু উৎপাটন করা গ্রামবাসী কর্তৃক। ৪. সরকার কর্তৃক এই মর্মে নির্দেশ দেয়া যে, আগামী তিন মাস কোন খুলনাবাসী যশোর যেতে পারবেনা। ৫. ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক আদালত অঙ্গন প্রশস্ত করার জন্য পার্শ্ববর্তী ভূমি দখল। আইনে এই কাজগুলো অবৈধ। কারণ স্বীকৃতি আদায় করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির শরীরে আঘাত করবার অধিকার আইন পুলিশকে দেয়নি। গ্রামের প্রধানকে আইন এই ক্ষমতা প্রদান করেনি যে,তিনি কাউকে শাস্তি দিতে পারেন। চুরি করলে চক্ষু তুলে নেওয়া হবে এমন কোন আইন বাংলাদেশে নাই। এক

www.pathagar.com

জেলার লোক অন্য জেলায় যেতে পারবেনা–এমন কোন আইন বাংলাদেশে নাই। আইনানুযায়ী নোটিশ না দিয়ে কারো খেয়াল খুশি মত সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইনে সমর্থন করে না। এই কাজগুলো আইনের শাসনের বিপরীতধর্মী আচরণ। এক্ষেত্রে দেখতে হবে কোন ব্যক্তি বা সরকার আইনের নাম করে বেআইনী কাজ করে ফেলছে কিনা? যেমন মহল্লায় মাস্তানী বেড়ে গেছে তাই পাড়ার সকল ছেলেকে বা যুবককে হাজতে নিয়ে যেতে হবে। একজন ছাত্র পুলিশের সিপাহীকে ঘুষি মেরেছে। অতএব সে কারণে সকল ছাত্রকে লাঠিপেটা করা হবে। এগুলো আইনানুযায়ী ব্যবহার নয়, এইগুলো আইনের শাসনের বিপরীত। এছাড়াও দেখতে হবে, যে আইনের নির্দেশানুসারে কোন ব্যক্তির উক্ত পাঁচটি অধিকারের কোন একটি স্পর্শ করা হচ্ছে সেই আইনটি সংবিধানসম্মত কিনা। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, সংসদ বা রাষ্ট্রপতি সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের সাথে অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন ও জারি করতে পারেন না।

এই অনুচ্ছেদ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ৭ নম্বর অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা মৌলিক অধিকারের ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদের শেষে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদঃ ৩২

আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

ভাষ্য

বাংলাদেশের সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে আইনের স্পষ্ট বিধান ছাড়া কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না।এই অধিকারের মধ্যে দুটি অর্থ নিহিত রয়েছে। একটি হাঁ–বাচক অপরটি না– বাচক। হ্যাঁ–বাচক অর্থে এই অধিকার ঘোষণা দিয়েছে যে, আইনের মাধ্যমে মানুষকে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যায়।

বিষয়টি বিস্তারিত বিবেচনার দাবী রাখে। সংবিধান বলছে, প্রত্যেক ব্যক্তি জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার লাভ করবেন। ব্যক্তিকে কেউ মেরে ফেলবে না বা ঘরে আটকে রাখবে না। যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে মেরে ফেলে তাহলে অন্যের বেঁচে থাকার অধিকার হরণের দায়ে আইন তাকে তার জীবন থেকে বঞ্চিত করতে পারে। তেমনি কোন ব্যক্তিকে আটক করার অপরাধে আইন তাকে আটক করে কারাদন্ড দিয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে পারে। এখানে একটি কথা সুস্পষ্ট যে, অধিকারের দাবীর সঙ্গে কর্তব্য পালনের বিষয়টি অপরিহার্য। কর্তব্য পালন না করলে শাস্তি দিবার বিধান আইনে রয়েছে। শাস্তি হিসেবে যদি কারো জীবন হরণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা হয় তাহলে তা করা যেতে পারে। এটাকেই বলে আইনের দ্বারা জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা।

সাধারণতঃ মৃত্যুদন্ড বা এ জাতীয় চরম শাস্তির মাধ্যমে ব্যক্তির জীবন থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। বাংলাদেশের আইনে মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশে মৃত্যুদন্ডের বিধান নেই। তবে প্রায় সকল দেশেই গ্রেফতার, আটক এবং কারাদন্ডের বিধান বিদ্যমান। যার মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে আইনের দ্বারা খর্ব করা হয়।

বিষয়টি একটু ভিন্ন ভাবে দেখা যেতে পারে। দুর্লভ মানবজীবন যে মহাপবিত্র, সংবিধান তা একাধিক স্থানে উচ্চ ও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে। এই সন্দেহাতীত ঘোষণা দুটি প্রত্যয়ের উৎস।এখানে একদিকে যেমন মানুষের জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহ অবিরাম অক্ষুণ্ন রাখার অধিকারটি মৌলিক তেমনি আবার যারা অসংগত কারণে অযৌক্তিক অজুহাতে মানুষের

www.pathagar.com

প্রাণসংহার করে তাদেরকে সমাজ থেকে অপসারণের লক্ষ্যে প্রাণদন্ড প্রদান আইনের বিধান।

যেমন জীবন তেমনি স্বাধীনতা। যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানুষ পেয়েছে প্রকৃতির নিকট থেকে সেগুলো ব্যবহারের সুযোগ লাভ এবং ব্যবহার প্রতিহত না হওয়ার অধিকার তার স্বাভাবিক জীবন পরিচালনার অঙ্গ। তাই এ অধিকার মৌলিক অধিকার রূপে গণ্য। কিন্তু যে অন্যের ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে আইন তার ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়। এভাবে আইনের দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী নয়।

বিষয়টি আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। সভ্য সমাজে স্বাধীন মানুষ হিসেবে বাঁচতে হলে প্রয়োজন জীবনের ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলা। এর অর্থ অন্যের দ্বারা এসব বিঘ্নিত না হওয়া। যে কতিপয় মানুষ অন্যের জীবনের বা ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে—তার জীবন ও স্বাধীনতা আইনের দ্বারা খর্ব করলে শৃঙ্খলা আসে। দুজনের স্বাধীনতার মধ্যে বিরোধ বাধলে আইন তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনে।

না-বাচক অর্থে আইনের অনুমোদন ছাড়া কোন মানুষের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করা যাবে না। নিম্নপদস্থ কর্মচারী বেআদবী করল বলে উচ্চতর কর্মচারী তাকে ক্ষুব্ধ হয়ে হাজতে পাঠিয়ে দিলেন। এরূপ কর্ম অবৈধ। আইনের বিধান ছাড়া এবং আইনসম্মত উপায় ছাড়া কারো স্বাধীনতা ও জীবন বিপন্ন করা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী, সচিব, পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল এমনকি রাষ্ট্রপতিও কোন ব্যক্তিকে জেল দিতে পারেন না, ফাঁসির আদেশ দিতে পারেন না; কারণ আইন তাদেরকে সে ক্ষমতা দেয়নি।

কোন ব্যক্তিকে জীবন ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে হলে যে আইনের মাধ্যমে তা করতে হয় সে আইনটি সংবিধান প্রদত্ত সীমার অন্তর্গত হতে হবে। সংসদ এই মর্মে আইন পাশ করল, যে ব্যক্তি সরকারের সমালোচনা করবে তার ছয় মাসের জেল হবে। এই আইন অনুসারে একজনের জেল হল। এই দন্ড আইনানুযায়ী হলেও যেহেতু আইনটি সংবিধানানুগ নয় সেহেতু তা অবৈধ। যদি কোন রুল বা বিধি বলে কারো স্বাধীনতা খর্ব করতে হয় তবে সে রুল বা বিধি আইনানুগ হতে হবে। রুলের মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে যা মূল আইন বহির্ভূত তা হলে সেটা অবৈধ। উপমহাদেশের উচ্চ আদালতসমূহ বলেছে, যে আসামীর পলায়ন করবার আশংকা নেই তাকে হাতকড়া বা হ্যান্ডকাপ পরানো অন্যায়। শুধু তাই নয়, যে আইন বা রুল বলে কারো ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে সে আইন বা রুলের ব্যাখ্যা উদার হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে কার্যবিধির মাধ্যমে কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করা হয় সে কার্যবিধি আইন ও বিবেকসম্মত হবে এটাই কাম্য।

কোন অভিযোগে কাউকে গ্রেফতার করতে হলে তাকে নোটিশ দিতে হয়। সাক্ষ্য প্রমাণ শেষ হলে তার শেষ বক্তব্য শুনতে হয়। এসকল বিধান কার্যবিধিতে থাকা আবশ্যক। সবশেষে প্রয়োগের বেলায় সত্যতা থাকতে হবে। বিচারক নিরপেক্ষ হবেন, বিচার মুক্ত আদালতে হবে, জনতার চাপ, সংবাদপত্রের চাপ থেকে মুক্ত থাকবেন বিচারক। এবং সর্বশেষে বিচার্য বিষয়ে বিচারকের কোন স্বার্থ থাকবে না। আইনের মাধ্যমে বলতে এগুলোই বুঝায়।

এই অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকার

এই মৌলিক অধিকারটি মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ৩ নম্বর অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। এতে বলা হয়েছে, "প্রত্যেকের জীবনে স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।"

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদঃ ৩৩

(১) গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

(২) গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেফতারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেফতারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে নাঃ

(ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু, অথবা

(খ) যাহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেফতার করা হইয়াছে এবং আটক করা হইয়াছে।

(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয়মাসের অধিককাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা রাখেন এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা পর্ষদ উক্ত ছয়মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ দানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্তকাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।

(৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশ প্রদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশের জন্য তাহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগ দান করিবেন;তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

(৬) উপদেষ্টা পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

ভাষ্য

এই অনুচ্ছেদের মূল বিষয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। যেহেতু বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ সেহেতু স্বাভাবিক অবস্থায় বাংলাদেশের সকল মানুষ স্বাধীন। কিন্তু এই স্বাধীনতা অবাধ ও নিরংকুশ নয়, অবাধ ও নিরংকুশ হতে পারে না। হওয়া উচিত নয়। স্বাধীনতা অবাধ হলে শৃঙ্খলা হারিয়ে যায়। ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, আইনের দ্বারা স্বাধীনতা খর্ব করা যায়। প্রয়োজনবোধে স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়, হতে পারে।

গ্রেফতার হচ্ছে একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে স্বাধীনতা খর্বিত হতে পারে। কিন্তু মানুষ গ্রেফতার হবে কেন? কোন ব্যক্তি যখন অপরাধ করেছে বলে অভিযুক্ত হয়, বা তাকে অপরাধে জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়, বা তাকে অপরাধে লিপ্ত অবস্থায় দেখা যায় তখন তাকে গ্রেফতার করা যায়। তাকে গ্রেফতার করা হয় একারণে যে, তাকে যা করতে দেখা যায়, বা তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এসেছে বা যে সন্দেহ জাগ্রত হয়েছে সে সম্পর্কে তাকে ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্য বাধ্য

www.pathagar.com

করা দরকার। আর অপরাধের উদ্যোগ নিলে তা হতে তাকে নিবৃত্ত করা আবশ্যক।

ম্যাজিস্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে অপরাধ করতে দেখলে তাকে গ্রেফতার করতে পারে। পুলিশ কোন ব্যক্তিকে গুরুতর অপরাধ করতে দেখলে, গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হলে বা সন্দেহভাজন হলে তাকে গ্রেফতার করতে পারে। সাধারণ মানুষও গ্রেফতার করতে পারে, যদি সে দেখতে পায় যে, তার সামনে কেউ গুরুতর অপরাধ করছে। ফৌজদারী কার্যবিধিতে এসব বিষয়ে বিধান প্রদত্ত হয়েছে। কোন ব্যক্তিকে আটক করে তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার করার জন্য হ্যান্ডকাপ পরানো জরুরী নয়।

গ্রেফাতারকৃত ব্যক্তির অনুকূলে কতিপয় মৌলিক অধিকারের উদ্ভব হয়। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে যথাশীঘ্র তার গ্রেফতারের কারণ জানাতে হবে। কেন জানাতে হবে? একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটি পরিষ্কার করা যেতে পারে। দবির একজন বাংলাদেশী নাগরিক এবং সে কারণে তার গ্রেফতার না হওয়ার অধিকার আছে। এবং সেই অধিকার মৌলিক। সাবেত একজন বাংলাদেশী পুলিশ ইন্সপেক্টর। ফৌজদারী কার্যবিধি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাকে গ্রেফতারের অধিকার দিয়েছে। সেই ক্ষেত্রগুলো ছাড়া যদি ইন্সপেক্টর সাবেত দবিরকে ধরতে যান, তবে দবির তাকে বাধা প্রদান করতে পারেন। সব ক্ষেত্রে ইন্সপেক্টরের আহবানে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডকাপ পরা সমর্থনীয় নয়। সেই জন্য কেন দবিরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে তা দবিরকে জানানো দরকার। এটাও হতে পারে যে, সাবেত দবিরকে সন্দেহমূলে গ্রেফতার করতে চান। সেক্ষেত্রে যে তথ্য ও প্রেক্ষিত সন্দেহের সৃষ্টি করেছে, দবির তার অন্যতর ব্যাখ্যা দিতে পারে। কি জন্য গ্রেফতার করা হল তা জানতে পারলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি জামিনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

যাকে ম্যাজিস্ট্রেটের প্রদত্ত ওয়ারেন্ট মূলে গ্রেফতার করা হয়, তাকে আর নতুন করে কারণ জানানোর প্রয়োজন নেই–ওয়ারেন্ট দেখালেই হল। কারণ ওয়ারেন্টেই গ্রেফতারের কারণ বর্ণিত হয়। যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেফতারের কারণ জানানোর কথা বলা হয়েছে। যথাশীঘ্র বলতে কোন সুনির্দিষ্ট সময় বুঝায় না। তবে এই যথাশীঘ্র যে চব্বিশ ঘন্টার বেশী নয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

দ্বিতীয়তঃ গ্রেফতারের অব্যবহিত পরে যে মৌলিক অধিকারটি গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অনুকূলে উদ্ভব হয়, তা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শ ও তার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার। এই অধিকার মৌলিক রূপে চিহ্নিত হল কেন? সহজ কথায় বলতে গেলে সাধারণ মানুষ আইনের অলিগলির সব খোঁজখবর রাখেন না, রাখতে পারেন না। কোন কোন কাজ কি কি ভাবে করলে তা অপরাধ হয় এবং কোন অপরাধের কি প্রতিক্রিয়া তা আইনজীবীদের জানার কথা, সাধারণ মানুষের নয়। কোন কুকর্ম করে ফেললেই মানুষকে গ্রেফতার করা যায় না। কোন প্রকৃতির কুকর্মে কোন ব্যক্তি গ্রেফতার করতে পারেন তা বুঝতে আইনগত জ্ঞানের দরকার হয় এবং সেটা আইনজীবীর পক্ষেই সম্ভব। সেই কারণে এই অধিকারকে মৌলিক রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সংবিধান সরকারের উপর আইনজীবী নিয়োগের দায়িত্ব অর্পণ করেনি। তদুপরি গ্রেফতারের পর যে ব্যক্তি জামিনে মুক্ত হয় তার অনুকূলে এই অধিকারটি উপজাত হয় না।

তৃতীয় যে মৌলিক অধিকারটি গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অনুকূলে উদ্ভব হয় সেটি হচ্ছে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করতে হবে। কিন্তু কেন করতে হবে? সকল সভ্যনীতির মধ্যে একটি মূল্যবান নীতি হচ্ছে, যথাশীঘ্র বিচার কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কারো স্বাধীনতা হরণ করা যাবে না। পুলিশের গ্রেফতারের লক্ষ্য হচ্ছে

www.pathagar.com

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে বিচারকের দরবারে পেশ করা। বিচারকের নিরপেক্ষ দৃষ্টি যদি গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির প্রতিকূলে যায়, তবে তাকে তা মেনে নিতে হবে।

চতুর্থতঃ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অধিকার আছে ম্যাজিস্ট্রেটকে তার বক্তব্য নিবেদন করার এবং তার আদেশ গ্রহণ করার।

এ যাবৎ যত অধিকারের কথা বলা হল তা বিদেশী শত্রু বা নিবর্তনমূলক আইনে আটক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা বলতে কি বুঝায়? যে দুষ্কর্ম হতে যাচ্ছে, তা না হতে দেয়ার বিধানকে নিবর্তন বলে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যে, কোন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে আটক না করলে সে বা তারা দেশ থেকে গোপন তথ্য পাচার করে বিদেশী শত্রুর গোচরীভূত করবে এবং দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। ঐসকল ব্যক্তিকে গ্রেফতার করবার বা সেই মুহূর্তে তাদের আটকের কারণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য জানানো বা আইনজীবীর পরামর্শ গ্রহণের সুবিধা প্রদান বা ২৪ ঘন্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ, এগুলোর কিছুরই দরকার পড়বে না। নির্বাহী আদেশে এরূপ গ্রেফতার বা আটক করা চলবে; তবে সংবিধানের নির্দেশ হচ্ছে সরকার এভাবে কোন ব্যক্তিকে ৬ মাসের অধিক আটক রাখতে পারবেন না, রাখতে হলে উপদেষ্টা পরিষদের অনুমতি লাগবে।

এই অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকার

বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের এই অনুচ্ছেদের সাথে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ৯ নম্বর অনুচ্ছেদের মিল রয়েছে। এতে বলা হয়েছে,"কাউকে খেয়াল খুশীমত গ্রেফতার, আটক অথবা নির্বাসন করা যাবে না।"

অনুচ্ছেদঃ ৩৪

(১) সকল প্রকার জবরদস্তি—শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে—

(ক) ফৌজদারী অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি আইনতঃ দন্ডভোগ করিতেছেন; অথবা

(খ) জনগণের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে।

ভাষ্য

এই অনুচ্ছেদের প্রথম দফায় জবরদস্তি–শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জবরদস্তি–শ্রম তাকেই বলে যা শ্রমিক করতে অনিচ্ছুক কিন্তু তাকে জোর করে করিয়ে নেয়া হয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে কাজ করা হলেও তা জবরদস্তি–শ্রম রূপে পরিগণিত হয়। কাজ করানোর পর অযোগ্যতার অজুহাতে যদি তাকে অর্থ না দেয়া হয় তবে তাও জবরদস্তি–শ্রম বলে গণ্য হবে। অবশ্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কেউ অন্যের অধীনে চুক্তির মূলে চাকুরি গ্রহণ করে কার্য করতে থাকে এবং বেতন নিতে থাকে তবে তাকে জবরদস্তি–শ্রম বলা যায় না। বেগার খাটানো প্রভৃতি এই নিষেধের আওতায় আসে তবে ওভারটাইম কাজ করা এই নিষেধের আওতায় আসে না।

এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় দফায় বলা হয়েছে যে, জবরদস্তি–শ্রম আদায় সম্পর্কে নিষেধ সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হবেনা। জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য রাষ্ট্র আইন করে জবরদস্তি–শ্রম আদায় করতে পারেন। জনসাধারণের কল্যাণ বলতে ব্যক্তির কল্যাণ বুঝায় না। যুদ্ধের সময় কম্পক্রিপশন বা সামাজিক কার্যের জন্য আইনের মাধ্যমে লোক আহবান করলে

www.pathagar.com

তা অসিদ্ধ হবে না। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ২৩ নম্বর অনুচ্ছেদ এই অনুচ্ছেদের সাথে তুলনীয়।

অনুচ্ছেদঃ ৩৫

(১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্য সংগঠনকালে বলবৎ ছিল—এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না। এবং অপরাধ সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইন বলে যে দন্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দন্ড দেওয়া যাইবে না।

(২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দন্ডিত করা যাইবে না।

(৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকারী হইবেন।

(৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দন্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

(৬) প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট কোন দন্ড বা বিচারপদ্ধতি সম্পর্কিত কোন বিধানের প্রয়োগকে এই অনুচ্ছেদের (৩) বা (৫) দফার কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

ভাষ্য

বাংলাদেশের সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে ছয়টি দফা আছে। প্রথম দফায় বলা হয়েছে যে, অপরাধ অনুষ্ঠানকালে প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হবে এবং সে আইন অনুযায়ী তার শাস্তির পরিমাণ নির্ধারিত হবে। একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন শিশুবিবাহ নিরোধ আইন (১৯২৯)-এর বর্তমান সংশোধনে বলা হয়েছে যে, আঠার বছরের কম কোন মেয়েকে বিবাহ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এক সময় এই বয়সসীমা ১৬ ছিল-তারও আগে ছিল ১৪ বৎসর। সময়সীমা ১৮ পুনর্নির্ধারণের আগে কেউ ১৭ বছর বয়সের কোন মেয়েকে বিবাহ করার কারণে এখন দন্ডিত হতে পারেন না। বিবাহ সম্পাদনকালে বিদ্যমান আইনে অপরাধ না হলে এখন তাকে অপরাধ বলা যাবে না।

বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত, দখল এবং ব্যবহারের জন্য বর্তমানে মৃত্যুদন্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৮০ সালে বিস্ফোরক দ্রব্য রাখার দায়ে এখন কাউকে ফাঁসিতে লটকানো যাবে না। এই কর্মের জন্য ৮০ সালে যে শাস্তির বিধান ছিল সেই সময়ে কৃত অপরাধের জন্য সে শাস্তিই দেয়া যাবে।

এর প্রথম কারণ হচ্ছে, আইন সাধারণতঃ কালাশ্রয়ী হয়ে থাকে। যেদিন আইন গেজেটে প্রকাশিত হয় বা যেদিন থেকে আইন কার্যকরী হয় সেই দিন থেকে রদ না হওয়া পর্যন্ত আইন যে কাজকে অপরাধ বলে—সেই কাজ অপরাধ গণ্য হয় এবং অপরাধীকে আইনে বর্ণিত শাস্তি দেয়া যায়। এর কম বেশী নয়।

দ্বিতীয়তঃ সংসদ এমন আইন পাশ করতে পারবে না বা রাষ্ট্রপতি এমন অধ্যাদেশ জারি করতে পারবেন না যার দ্বারা কোন ব্যক্তির অতীত কর্মকে বর্তমানে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে

www.pathagar.com

চিহ্নিত করা হয় বা অতীত অপরাধের শাস্তি বৃদ্ধি করা হয়। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় যে, ফৌজদারী আইন যেদিন জারি করা হয় সেই দিন হইতে এর কার্যকারিতা শুরু হয়, পূর্বের কোন তারিখ থেকে তা বলবৎযোগ্য নয়। এর কারণ স্পষ্ট। আইন যে কর্মকে অপরাধ বলে, শুধু সে কর্মই অপরাধ। বিধবার ইচ্ছেমত তার সঙ্গে কোন পুরুষের যৌনমিলন বর্তমানে কোন অপরাধমূলক কর্ম নয়। ভবিষ্যতে যদি এই কর্মকে অপরাধমূলক বলে কোন আইন তৈরী হয় তাহলে বর্তমানের কর্মের জন্য সেই সময় শাস্তি পাবে না, শাস্তি দেয়া যাবে না।

তৃতীয়তঃ ফৌজদারী আইনে দন্ডবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হলেও ফৌজদারী কার্যবিধির উপর এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ নয়। ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত বা সংঘটিত কাজের বা অপরাধের বিচার ১৯৮৫ সালে পরিবর্তিত কার্যবিধি অনুযায়ী করা যায়, তাতে কোন বাধা নেই। বিশেষ অপরাধের বিচার অতঃপর সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে হবে, এমন আইন অবৈধ নয়।

চতুর্থতঃ নিবর্তনমূলক আইনের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য নয়। এই আইন বিনা বিচারে মানুষকে আটক রাখার ক্ষমতা দেয়। সেই আইনের পূর্বপ্রয়োগ অবৈধ নয়; কারণ নিবর্তনমূলক আইনের আওতায় কোন দন্ড বা শাস্তি দেওয়া হয় না, আটক রাখা হয় মাত্র। ১৯৮৫ সালে এই জাতীয় আইন পাশ করে ১৯৮৪ সালের কাজের জন্য মানুষকে আটক করা যায়।

পঞ্চমতঃ দেওয়ানী আইনের ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ নেই। ১৯৮৭ সালে আইন করে সরকার বলতে পারেন যে, কয়েকটি শর্ত পূরণ না করলে ১৯৮০ সালের লীজ বাজেয়াপ্ত হবে।

ষষ্ঠতঃ পরবর্তী আইনে যদি কোন কর্মকে আর অপরাধ বলে গণ্য হবে না, এমন কথা বলা হয় তবে তার দ্বারা পূর্বে কৃত অপরাধের শাস্তি থেকে আসামী রেহাই পাবে না, একই কারণে দন্ডিত আসামী মুক্তি পাবে না, তবে তার শাস্তি হ্রাস পেতে পারে মাত্র।

দ্বিতীয় দফায় বলা হয়েছে যে, এক অপরাধের জন্য একাধিকবার কেস করা যাবে না বা দন্ড দেয়া যাবে না। আমার জনৈক বন্ধুর মুখে শুনা একটি চৈনিক কাহিনী এখানে পরিবেশন করছি, যা থেকে এই দফার বক্তব্য অনুধাবন সহজ হবে।

কিং নামক এক ব্যক্তি চুং নামক অপর এক ব্যক্তিকে খুন করার দায়ে অভিযুক্ত হয়। বিচারে তার দশ বছরের কারাদন্ড হয়। আসলে চুং নিহত হয়নি, সে সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী দেশে চলে গিয়েছিল। এইসময় তার চেহারার মত একজন ভিখারী ঐ এলাকায় মারা যায়। কিং-এর শত্রুরা এই মৃত ভিখারীর দেহটা কাজে লাগায় এবং সুন্দরভাবে কেস সাজায়। কিং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগটি তারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে আদালতে প্রতিষ্ঠিত করে। কিং দশ বছর জেল খেটে ছাড়া পেয়ে বাড়ীতে ফিরে আসে। এর কয়েকদিন আগে চুং দেশে ফিরেছিল। কিং চুংকে বাজারে ঘুরতে দেখে বাড়ী ছুটে আসে। বাড়ী থেকে একটি ধারালো ছুরি নিয়ে এসে সে চুং-এর বুকে আমূল বসিয়ে দেয়। এরপর সে চিৎকার করে বলতে থাকে চুংকে আমি খুন করিনি তবু আমার জেল হয়েছিল কিন্তু এবার আমি চুংকে হত্যা করেছি, তবুও আমার কিছু হবেনা। কারণ এক অপরাধের দুইবার বিচার হয়না।

তৃতীয় দফায় বলা হয়েছে যে, আদালত বা ট্রাইব্যুনাল স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হবে এবং তাদের বিচার হবে দ্রুত ও প্রকাশ্য। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বলতে বুঝায়, বিচারক এমন পরিস্থিতির শিকার হবেন না, যার দ্বারা তার স্বাধীনতা বা নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হয়। আমেরিকার উচ্চ আদালত বলেছেন, উগ্র জনতার উত্তেজক কথাবার্তার বা সংবাদপত্রের সমালোচনার দ্বারা বা টেলিভিশনে আসামীর স্বীকারোক্তির দ্বারা বিচারকের নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হতে পারে। আমেরিকার উচ্চ আদালত বলেছেন যে, বিচারকের ব্যক্তিগত বা আর্থিক স্বার্থ দ্বারা তার নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হতে পারে। যদি কোন বিচারকের সাথে মামলার পক্ষগণের স্বার্থের

www.pathagar.com

বিন্দুমাত্র যোগসূত্র থাকে তবে তিনি উক্ত মামলার বিচার করবেন না। বিচারকের নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হতে পারে নানা প্রকারের প্রভাবাদির দ্বারা।

বিচার দ্রুত ও প্রকাশ্য হতে হবে। প্রকাশ্যতা নিরপেক্ষতার বাণী বহন করে। বিচারকের বিচারকার্যের কোন গোপনীয়তা থাকা উচিত নয়।

বিচারাদালত বলতে শুধু সুপ্রীম কোর্ট বুঝায় না, বুঝায় সকল আদালত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে বলতে পারি যে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের নিম্নতম স্তরে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার প্রয়োজনীয়তা কম নয়। সেই স্তরে বিচারকবৃন্দ যদি কোন প্রকার চাপের সম্মুখীন হন তাহলে তা এড়ানো সুপ্রীম কোর্টের সাথে তুলনামূলকভাবে অনেক কঠিন।

শেষ দুটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, বর্তমানে যে আইন আছে, তা থাকতে পারবে কিন্তু অতঃপর আর নিষ্ঠুর অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দন্ড দেয়া যাবে না। পুড়িয়ে, দড়ি দিয়ে বেঁধে গাড়ীর পিছনে টানা, ক্রুশে বিদ্ধ করে মারা, পা উপরে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা, অনাহারে রাখা, বা তৃষ্ণায় রাখা প্রভৃতি নিষ্ঠুর শাস্তি। নিষ্ঠুর শাস্তি মৌলিক অধিকারপরিপন্থী।

এই অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকার

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ১১ নম্বর অনুচ্ছেদের খ পরিচ্ছেদের সাথে এর মিল রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "কাউকে কোন কাজ বা ত্রুটির জন্য দন্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না যদি সংঘটনকালে তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দন্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য না হয়ে থাকে। আবার দন্ডযোগ্য অপরাধ সংঘটনকালে যতটুকু শাস্তি প্রযোজ্য ছিল তার চেয়ে অধিক শাস্তি প্রয়োগ চলবে না।

অনুচ্ছেদঃ ৩৬

জনস্বার্থে আইনের আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যেকোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

ভাষ্য

বাংলাদেশের সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য তিনটি মৌলিক অধিকারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এর প্রথমটি হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধে চলাফেরার, দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাংলাদেশের যেকোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন করার এবং সর্বশেষটি হচ্ছে বাংলাদেশ ত্যাগ এবং বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করার।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল যে, পাকিস্তানের ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানে এবং ভারতীয় সংবিধানে চলাফেরার স্বাধীনতা বিধৃত ছিল। কিন্তু দেশত্যাগ ও দেশে পুনঃপ্রবেশের অধিকার ঐ সংবিধানে বর্ণিত হয়নি। তবে পাকিস্তান ও ভারতের উচ্চ আদালতসমূহ দেশত্যাগ ও পুনঃপ্রবেশের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে যদিও চলাফেরার স্বাধীনতার উল্লেখ নেই, তবুও সেদেশের সুপ্রীম কোর্ট এই অধিকারটিকে মৌলিক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। একদা জনৈক মার্কিন নাগরিক পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছিলেন কিন্তু তাকে পাসপোর্ট দেয়া হয়নি এই অভিযোগে যে, তিনি কমিউনিষ্ট। বিষয়টি সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। সেই কেসে (Kent v Dulles, ৩৫৭ খ.ও. ১১৬) বিচারপতি ডগলাস বলেন, ভ্রমণের অধিকার এমন একটি স্বাধীনতা যা হতে নাগরিককে বঞ্চিত করা যায় না। বিদেশ ভ্রমণ এবং স্বদেশ ভ্রমণ এমন একটি অধিকার যা খাওয়া-পরা এবং

www.pathagar.com

পড়ার অধিকারের মত। আমরা যে মৌলিক অধিকারে বিশ্বাস করি এবং আমাদের যে মূল্যবোধ, সে অনুসারে এই স্বাধীনতা মৌলিক।

বাংলাদেশের সংবিধান এই অনুচ্ছেদের প্রথম দফায় যে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে তা হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বত্র চলাচলের অধিকার। সর্বত্র চলাচলের অধিকার বলতে বুঝায় বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি জমিতে পদার্পণের অধিকার প্রতিটি নাগরিকের আছে। বাংলাদেশ বলতে বুঝায় তিনটি অঞ্চল। (১) যে অঞ্চল স্বাধীনতার পূর্বে পূর্বপাকিস্তান বলে পরিচিত ও পরিগণিত ছিল (২) বাংলাদেশ-ভারত চুক্তির ফলে যে অঞ্চল বাংলাদেশ পেয়েছে। (৩) বাংলাদেশের সমুদ্রের সন্নিহিত অঞ্চল। এই বিস্তীর্ণ ভূমির প্রতিটি কণাকে বাংলাদেশের ভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাই এর সর্বত্র চলাফেরার অধিকার, বিচরণের স্বাধীনতা প্রতিটি নাগরিকের আছে। বাংলাদেশীদের কাছে বাংলাদেশের কোন অঞ্চল বিদেশ নয়। আইনের চোখে উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ বলে কিছু নেই। সুতরাং কবি ইকবালের "সারা জাঁহা হামারার" মত সারা বাংলাদেশই আমাদের। বাংলাদেশের নাগরিক দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাওয়ার জন্য কোন বাধার সম্মুখীন হবে না। তার জন্য লাগবে না কোন অনুমতিপত্র বা পারমিট। এটাই এই অধিকারের মূল কথা। আর যদি তা লাগত তবে বাংলাদেশ একদেশ হতো না এবং এই দেশ বাংলাদেশীর হত না।

দ্বিতীয় অধিকারটি হচ্ছে বাংলাদেশের যেকোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপনের অধিকার। প্রশাসনিক কারণে বাংলাদেশকে বিভাগ, জিলা ও থানায় বিভক্ত করা হয়েছে বটে কিন্তু তাই বলে এক জিলা অন্য জিলা থেকে পৃথক হয়ে যাবে না। সমগ্র বাংলাদেশ সকল বাংলাদেশীর প্রিয় বাসভূমি। সকলের কাছে এটা আমার সোনার বাংলা। বাংলাদেশ একটি রাষ্ট্র। এই কারণে এর সকল স্থানে সকলের বসতি স্থাপনের অধিকার আছে। বসতি স্থাপন এবং বসবাসের জন্য বাংলাদেশীদের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। এটাই এই অধিকারের মূল কথা।

তৃতীয় অধিকারটি হচ্ছে বাংলাদেশ ত্যাগ ও পুনঃপ্রবেশের অধিকার। সমগ্র বিশ্ব মানবজাতির জন্মভূমি ও আবাসস্থল। রাজনৈতিক কারণে নিখিল বিশ্ব বহু দেশে বিভক্ত হয়েছে বটে কিন্তু মানবিক মর্যাদায় সে যে বিশ্বনাগরিক, তাই সেই মর্যাদায় আজও সে প্রতিষ্ঠিত।

তবে এই অধিকারগুলো একেবারে অবাধ নয়। বরং এগুলো জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধের অধীন। বস্তুতঃ কোন স্বাধীনতাই অবাধ নয়। একজন মানুষ যেমন নিজের বিকাশ চায় তেমনি সমাজের অন্য মানুষেরাও তাদের বিকাশ চায়। এই দুই-এর মধ্যে সমঝোতা না থাকলে নৈরাজ্য এসে পড়বে। আইনের মাধ্যমে তাই যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করা যায়। এই বাধানিষেধ বস্তুতপক্ষে স্বাধীনতার পরিপূরক। ব্যক্তির অধিকার এবং স্বাধীনতা আছে যত্রতত্র যাওয়ার কিন্তু তাই বলে অপরের ঘরে প্রবেশের স্বাধীনতা নেই। কারণ নিজের ঘরে নিরুপদ্রব বসবাসের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। ঘরে প্রবেশের ব্যাপারে বাধানিষেধ উভয়ের নিরাপত্তার জন্য দরকার; নইলে ঘরের শান্তি বিনষ্ট হবে।

বাধানিষেধও সীমাহীন নয়। এরও কিছু সীমা আছে। যেমন প্রথমতঃ তা আইন দ্বারা আরোপিত হতে হবে। কোন নির্বাহী নির্দেশ দিয়ে এই অধিকার খর্ব করা চলবে না। যে আইন দ্বারা এই বাধানিষেধ আরোপ করা হয় তা সংবিধানানুগ হতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ যে আইন দ্বারা বাধানিষেধ আরোপ করা হবে তাকে যুক্তিসঙ্গত হতে হবে। যুক্তিসঙ্গত বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। যার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা আছে, ধরে নেয়া হয় যে, তিনি যে আইন প্রণয়ন করছেন তা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এটা একটা অনুমানমাত্র।

www.pathagar.com

কোন আইন যুক্তিসঙ্গত কিনা তা নির্ধারণের দায়িত্ব আদালতের। এই প্রশ্নের মীমাংসা করার সময় আদালত দেখেন যে, বাধানিষেধটি প্রকৃতিতে খামখেয়ালীপূর্ণ কিনা এবং তাতে প্রয়োজনের তুলনায় বাড়াবাড়ি আছে কিনা। যেখানে জনস্বার্থে যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপের অধিকার সংবিধান দিয়েছে সেখানে ব্যক্তিস্বার্থেই তা আরোপিত হচ্ছে কিনা তা আদালত বিচার করে দেখেন। মন্ময় দৃষ্টিতে নয়, তন্ময় দৃষ্টিতে আদালত এই বিচার করেন। যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপের সময় আইনে যে কার্যপদ্ধতির বিধান থাকে তাও আদালত দেখেন।

সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছে যে, বাধানিষেধের আইনটি জনস্বার্থমূলক হতে হবে। জনস্বার্থ বলতে সমষ্টির স্বার্থ বুঝায়, ব্যক্তির স্বার্থ নয়। যে আইন দ্বারা বাধানিষেধ আরোপ করা হয়, সে আইন যদি সামগ্রিক স্বার্থে না হয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে বা কয়েকজনের স্বার্থে হয়, তবে সে আইন আদালত বাতিল ঘোষণা করেন। বাধানিষেধ আরোপ না করলে যে ক্ষতি হত সেই ক্ষতিটুকু এড়াবার জন্য যতটুকু বাধানিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন তার বেশী করা হলে ঐ আইন বাতিল গণ্য হবে। অবস্থা ও পরিস্থিতিতে কোন আইনের যৌক্তিকতার নিরিখও পরিবর্তিত হতে পারে।

বাধানিষেধ আরোপের আইন যদি কোন ব্যক্তিকে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী করে তবে সেই আইন সাধারণতঃ সংবিধানে গ্রাহ্য হয় না।

বাংলাদেশের দন্ডবিধিতে বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের উপর লিখিত বা মৌখিকভাবে আঘাত করে তবে সে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে এবং তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য আদালত আদেশ প্রদান করতে পারে। ফৌজদারী কার্যবিধির মধ্যে কিছু কিছু বিধান আছে যেখানে অপরাধ প্রতিরোধকল্পে মানুষের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সংক্রামক রোগের প্রতিরোধের জন্য বা প্রসার বন্ধের জন্য চলাফেরার স্বাধীনতাকে আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

এই অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকার

সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের সাথে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদের মিল রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, (ক) প্রত্যেক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল ও বসতি স্থাপনের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। (খ) প্রত্যেকেরই নিজদেশসহ যেকোন দেশ ছেড়ে যাওয়ার ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদঃ ৩৭

জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

ভাষ্য

এই অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু হচ্ছে সমাবেশের স্বাধীনতা। এই অনুচ্ছেদ বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য তিনটি মৌলিক অধিকারের ঘোষণা দিয়েছে। (১) সমবেত হওয়ার (২) জনসভায় যোগদান করবার এবং (৩) শোভাযাত্রায় যোগদান করবার। তবে সকল অধিকার

www.pathagar.com

যেমন কতিপয় শর্তের অধীন, তেমনি এই অধিকারত্রয় তিনটি শর্তের অধীনঃ (১) এই সমাবেশ হবে শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র, (২) জনশৃঙ্খলার স্বার্থে আইন দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধের অধীন এবং (৩) জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা যুক্তিসংগত বাধানিষেধের অধীন।

গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে রাষ্ট্রের সকল কর্মে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণ ও মত পোষণ করা ও মতামত প্রকাশের অধিকার। দেশের বিভিন্ন স্তরে আজ যে অবস্থা বিদ্যমান কেউ এই অবস্থাকে সঠিক এবং কল্যাণকর মনে করতে পারেন আবার কেউ এটাকে সঠিক নয় মনে করতে পারেন। যারা বর্তমান অবস্থাকে সঠিক নয় বা অকল্যাণকর মনে করেন তারা তাদের ধ্যানধারণাকে প্রকাশ করতে পারেন। তাদের অধিকার আছে অন্যদের তাদের চিন্তাধারা বুঝিয়ে নিজের দলে টেনে আনা। যারা সঠিক মনে করেন তাদেরও অধিকার আছে নিজেদের মতামত অন্যদের বুঝানো এবং নিজের মতের অনুকূলে মতামত গড়ে তোলা। অভিমত প্রকাশ এবং অন্যদের প্রভাবিত করার জন্য সমবেত হওয়ার অধিকার সকলেরই আছে।

পৃথিবীর অপরাপর গণতান্ত্রিক দেশের মত বাংলাদেশেও রাজনৈতিক দল আছে। একাধিক দল, অনেক দল। প্রায় সকল দলেরই আদর্শ, উদ্দেশ্য, ও কর্মসূচী আছে। এগুলো প্রচারিত না হলে দেশের প্রতি তাদের ভালবাসা লোকে বুঝবে না। তাঁদের প্রয়াস এবং প্রচেষ্টার কথা লোকজনকে জানানোর জন্য সভা সমাবেশ ইত্যাদি আবশ্যক।

জনসভা দেশের জন্য কল্যাণকর হতে পারে। জনসাধারণ তাদের কথা শুনে, তাদের কর্মসূচীর ব্যাখ্যা পেয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারে। এবং এই জ্ঞানের ভিত্তিতে তারা যেকোন দলকে সমর্থন করতে পারে।

শুধু রাজনৈতিক দল কেন, ধর্মীয়, সম্প্রদায়, সামাজিক সম্প্রদায়, পেশাভিত্তিক সম্প্রদায় তাদের নিজেদের বক্তব্য বুঝার ও বুঝানোর জন্য সভা সমাবেশ করতে পারে। রাজনৈতিক দল বা চাপ সৃষ্টিকারী সংস্থা তাদের বক্তব্য বা দাবীকে জোরালো করার জন্য শোভাযাত্রা বা মিছিল করতে পারে। এই অধিকারটিও মৌলিক। জনসভা, সমাবেশ, শোভাযাত্রা, মিছিল ইত্যাদি করার অধিকার যেমন মৌলিক, এগুলোতে যোগদানের অধিকারও তেমনি মৌলিক। বরং বলা যায় যে, এই অধিকারগুলো এতই মৌলিক যে এগুলো যাতে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের অধিকার সরকারের।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ আদালত বলেছে, সরকার যেখানে গণতান্ত্রিক সেখানে সকল নাগরিকের অধিকার থাকে শান্তিপূর্ণভাবে অন্যান্যের সাথে মিলিত হয়ে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ করা। উচ্চ আদালত আরো বলেন, এই প্রকার মুক্ত রাজনৈতিক আলোচনা দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিবর্তন সম্ভব। এবং এই কারণে সমাবেশের অধিবেশন পূর্বানুমতি সাপেক্ষে হতে পারে না।

শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশের স্বাধীনতা না থাকলে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের তৎপরতা চালাবার জন্য গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক তৎপরতাকে গোপনীয়তার পথে ঠেলে দেয়া উচিত নয়।

তবে জনশৃঙ্খলার কারণে এই অধিকারকে সংযত রাখা যেতে পারে। জনশৃঙ্খলা বলতে বুঝায় সেই অবস্থা যেখানে জনগণ শান্তিতে ও নিরাপদে থাকতে পারে। সে কারণে গণশান্তিতে

www.pathagar.com

বিঘ্ন উৎপাদনকারী সবকিছুই জনশৃঙ্খলার পরিপন্থী। দন্ডবিধির অষ্টম অধ্যায় দন্ডবিধির ১৫৩ (ক) ধারা এবং ১৯৫ (ক) ধারা গণশান্তি বিঘ্নকারী আইনের বর্ণনা দিয়েছে। এগুলোতে সমাবেশ, বেআইনী সমাবেশ, গণশান্তি ভঙ্গ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান দেয়া হয়েছে। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ২০ নম্বর অনুচ্ছেদের বিশ্লেষণে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকার

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ২০ নম্বর অনুচ্ছেদের সাথে এই অনুচ্ছেদের মিল রয়েছে। মানবাধিকারের ঐ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, (ক) প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার রয়েছে। (খ) কাউকে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

অনুচ্ছেদঃ ৩৮

জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

ভাষ্য

সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে সমিতি বা সংঘ গঠন করবার। তবে সে অধিকার দুটি কারণে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। সে দুটি কারণ হচ্ছে জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা।

প্রথমে দেখা যাক, এই অধিকারকে মৌলিক অধিকার রূপে চিহ্নিত করবার কারণ কি? একত্রিত হওয়া প্রকৃতিদত্ত সহজাত স্বভাব। মানুষ একা থাকতে ভালবাসে না, একা থাকতে চায় না। সে নানাভাবে অন্য মানুষের সাথে মিলিত হতে চায়। সে ক্লাব গড়ে, সমিতি বানায়, সংঘ গড়ে, প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে। সাধারণতঃ তিনটি কারণে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়, সংগঠিত হয়।

প্রথমতঃ মিলিত হওয়া মানুষের স্বভাব। বাইবেলে বলা হয়েছে, আদি পিতা আদম নিজেকে সৃষ্টির পর থেকে বড় একাকী ভাবছিলেন। একটা অতৃপ্তি তার মনের মধ্যে বেদনা দিতেছিল। তাকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করবার জন্য ঈশ্বর তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করলেন। এই কাহিনী বড়ই তাৎপর্যবহ। এতে বুঝা যায়, মানুষ সঙ্গ চায়;এটা তার স্বভাব।

দ্বিতীয়তঃ একজন মানুষ আজ যা ভাবছে, সে ভাবনা আজকের জন্য একান্তই তার। আগামীকাল প্রত্যুষে তার মনে এই চিন্তা জাগ্রত হবে যে, তার ভাবনা কি মূল্যবান, সত্য, কার্যকর এবং বস্তুনিষ্ঠ, না এটা আকাশকুসুম বা অবাস্তব কল্পনা। তার মন চাইবে তার ভাবনাটিকে যাচাই করে নিতে। এই যাচাই সে কোথায় করতে পারে। তার জন্য চাই কোন মিটিং, আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা অন্য কিছু। একটি ভাবনা, একটি আদর্শ, একটি কার্যপদ্ধতি, একটি পরিকল্পনা, একটি বিশ্বাস বা একটি বিনোদনমূলক কর্মকান্ডকে কেন্দ্র করে সমিতি বা সংঘ গড়ে উঠতে পারে।

www.pathagar.com

দলের বা সমিতির মাধ্যমে একজনের চিন্তাভাবনা দশজনের এবং দশজনের চিন্তাভাবনা হাজার জনের হতে পারে। মতামতের আদান প্রদান, মতবিনিময় ইত্যাদির জন্য সমিতি, সংঘ আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ একজনের পক্ষে সকল কাজ করা সম্ভব নয়। একজনের পক্ষে দাবী আদায় করা সম্ভব নয়। একজনের চিৎকার কেউ শুনতে চায় না। কারণ ব্যক্তি মাত্রেই দুর্বল। কিন্তু হাজারজন একত্রিত হলে সেই দুর্বলতা আর থাকে না। একক ব্যক্তি যেমন দুর্বল তেমনি সংগঠিত ব্যক্তি অত্যন্ত শক্তিমান। শক্তির প্রয়োজনে মানুষ সংগঠিত হয়। সংগঠিত হয় মানুষ নিজেদের আওয়াজকে জোরালো করার জন্য, দাবীকে জোরদার করার জন্য, উচ্চারণকে তীব্র করার জন্য।

বর্তমানকালে আমরা যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিচালিত ও প্রতিপালিত হচ্ছি সেটা সংগঠিত হওয়ার প্রয়াসেরই বাস্তব রূপ।

অনুচ্ছেদঃ ৩৯

(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃংখলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে—

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হইল।

ভাষ্য

সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের প্রথম দফায় চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় বাকস্বাধীনতা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার যে মৌলিক অধিকার প্রদত্ত হয়েছে তা নানাবিধ কারণে যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধের অধীন। কিন্তু চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা কোন বাধানিষেধের অধীন নয়। চিন্তা ও বিবেক সম্বন্ধে রাষ্ট্র কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ করবেন না; প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করবেন চিন্তা ও বিবেকের প্রকাশকে।

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা সভ্যদেশের সকল নাগরিকের একটি বহুল **বাঞ্ছিত** অধিকার। আমাদের সংবিধান এই স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে।

বাকস্বাধীনতাঃ মুক্ত ও অবাধ আলোচনা বাকস্বাধীনতার অন্তর্গত এবং এই আলোচনার পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে কথা বলবার স্বাধীনতা এই স্বাধীনতার অন্তর্গত।

ভাব প্রকাশের স্বাধীনতাঃ এই স্বাধীনতার এলাকা এবং পরিধি বাক্‌স্বাধীনতার এলাকা ও পরিধি হতে বহুগুণ বৃহৎ। ধ্বনি, লেখনি, চিত্র, অভিনয়, ভঙ্গিমা, ব্যানার, ফেস্টুন অথবা এই শ্রেণীর অন্য মাধ্যম দ্বারা ভাবপ্রকাশ এই স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা বলতে শুধু নিজের ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতাকেই বুঝায় না, অন্যের ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতাকেও

www.pathagar.com

বুঝায়।

ভাবপ্রকাশের মধ্যে ভাবপ্রচারও অন্তর্ভুক্ত। প্রচারিত না হলে ভাবপ্রকাশ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। রেডিও, সিনেমা, গ্রামোফোন, লাউডস্পীকার প্রভৃতিতে ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতাঃ এই স্বাধীনতার অর্থ লিখবার এবং তা প্রকাশ করবার স্বাধীনতা। বস্তুতঃ বাক্‌স্বাধীনতা এবং ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রকাশিত হবার পূর্বে ভাবপ্রকাশকে বাধাদান সাধারণ অবস্থায় অসিদ্ধ। স্বাধীন মানুষের মনে যে ভাবরাজি সর্বদা উত্থিত হয়, স্বেচ্ছায় সে তা জনসমক্ষে উপস্থিত করতে পারে। একে নিষিদ্ধ করা এই স্বাধীনতাকে নিষিদ্ধ করবার সামিল। প্রকাশিত হবার পর কিছু অন্যায় হয়ে থাকলে প্রকাশকই দায়ী।

প্রচারের স্বাধীনতা ও সম্পাদনা বিভাগে চাকুরির স্বাধীনতা সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞাপন, লিফলেট, প্রচারপত্র প্রকাশ করাও এই স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। তবে এই স্বাধীনতা কতিপয় সীমার অধীনঃ

(ক) বাক্‌স্বাধীনতার প্রথম সীমাঃ আদালত বা বিচার বা বিচারক সম্পর্কীয় উক্তিতে বিন্দুমাত্র অবমাননা প্রকাশ শাস্তির যোগ্য। বিচারকগণ অপাপবিদ্ধ অথবা বিচ্যুতিবিহীন মহামানব বা নরাবতার নন। কিন্তু তবুও মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিচারের ব্যাপারে বিচারককে সমালোচনার উর্ধ্বে রাখা হয়েছে। বিচারকগণ বিচারকার্যের সময় যদি একটা নির্ভয়তার আশ্রয় উপলব্ধি না করেন, যদি তিনি বিত্তশালী এবং প্রতিষ্ঠাবান লোকের বিরূপ সমালোচনার আশঙ্কায় কম্পিত থাকেন তবে তার সিদ্ধান্ত প্রভাব-নিরপেক্ষ হতে পারে না। বিচারককে তাই সমালোচনার উর্ধ্বে রাখা একটা বাঞ্ছনীয় রীতি। সবদেশেই কোন বিচারককে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা কিংবা তার কাজে বাধা প্রদান করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কোন মোকদ্দমা যখন বিচারাধীন থাকে, তখন সেই মোকদ্দমার ফলাফল সম্পর্কে বিচারককে প্রভাবান্বিত করার কোন চেষ্টা করা, বিচারকের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা, বিচারকের ন্যায্য আদেশ ও নিষেধ প্রতিপালন না করা প্রভৃতিও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। Contempt of Court Act এবং দন্ডবিধির ২২৮ ধারা আদালত অবমাননা সম্পর্কীয় আইনের ধারক।

(খ) বাক্‌স্বাধীনতার দ্বিতীয় সীমাঃ যে উক্তিতে অন্যের অপযশ হয়, সেই অপযশ সৃষ্টিকারী লিখিত ও মৌখিক প্রকাশ বা উক্তি শাস্তির যোগ্য, অন্য কথায় বাক্‌স্বাধীনতা অন্যের অপযশ কীর্তনের অধিকার দেয় না।

(গ) বাক্‌স্বাধীনতার তৃতীয় সীমাঃ বাক্‌স্বাধীনতা মানুষকে অশ্লীল হবার অধিকার দেয় না। যে উক্তি, যে সাহিত্য বা যে চিত্র মানুষের কামরিপুকে উদ্দীপ্ত বা উজ্জীবিত করে তা প্রকাশের অধিকার সভ্যসমাজে অস্বীকৃত। শ্লীল এবং অশ্লীলের মাঝখানে যে সীমারেখা টানা হয়েছে যুগে যুগে তা পরিবর্তিত এবং বিবর্তিত হয়েছে — সেই সীমারেখা অতীব জটিল এবং সূক্ষ্ম। আইন দর্শনের সূত্র এই যে, যা মানুষকে কলুষিত করে তাই অশ্লীল। কিন্তু কোন্‌টা মানব মন কলুষিত করে কোন্‌টা করে না, সে প্রশ্ন অতি দুরূহ। এই সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত।

(ঘ) বাক্‌স্বাধীনতার চতুর্থ সীমাঃ রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক মৌখিক এবং লিখিত সমস্ত উক্তি

www.pathagar.com

আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যেসব উক্তি মানুষের মনে রাষ্ট্রের প্রতি হিংসা বা ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করে, সে সমস্ত উক্তি পর্যন্ত বাক্‌স্বাধীনতার সীমায় পৌঁছায় না। এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য যেকোন বিশেষ দলের সরকারকে সমালোচনা রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ভুক্ত নয়। যে উক্তিগুলি নাগরিকবর্গের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে রাষ্ট্রের ধ্বংসের কাজে উৎসাহিত করে, সেই সমস্ত উক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ভুক্ত।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখবার প্রয়োজনে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র ন্যায়তঃ এবং স্বভাবতঃ এই দাবী করতে পারে যে, রাষ্ট্রের সমস্ত নর-নারী রাষ্ট্রের প্রতি এবং রাষ্ট্রীয় সংবিধানের প্রতি অনুগত থাকবে। রাষ্ট্র যে সরকার দ্বারা পরিচালিত হয় সেই সরকারের গৃহীত নীতি এবং পদ্ধতি কখনই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কিন্তু যে সমস্ত উক্তি রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করে, কোনদিনই সেগুলি সমর্থিত হতে পারে না। কোন উক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক আর কোন্‌টা নয়, তা নির্ভর করে বক্তার মনের ভাবের উপর এবং যাদের সামনে উহা প্রকাশিত হচ্ছে তাদের মানসিক অবস্থার উপর এবং সর্বশেষে স্থান ও কালের উপর।

(ঙ) **বাক্‌স্বাধীনতার পঞ্চম সীমাঃ** শান্তিভঙ্গমূলক কোনো লিখিত বা মৌখিক উক্তি আইনের দৃষ্টিতে অমার্জনীয়। দেশে এবং সমাজে শান্তি অক্ষুণ্ন রাখবার দায়িত্ব সরকারের; তাই এই দায়িত্বের পরিপন্থী কোন কার্যকে সরকার বরদাস্ত করে না। যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন কিছু বলেন বা লিখেন বা অন্যভাবে প্রকাশ করেন, যার দ্বারা দেশের বিভিন্ন সমাজ এবং শ্রেণীর মধ্যে ঘৃণার ও হিংসার উদ্রেক হয় তবে তিনি আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী। কোন অলিআল্লাহ্, পীর, ফকির বা দরবেশের বিরুদ্ধে, কোন ধর্ম বা ধর্মীয় নেতার বিরুদ্ধে, কোন জাতি, গোষ্ঠী বা পেশার বিরুদ্ধে অসত্য উক্তি সমর্থনযোগ্য নয়।

বলাবাহুল্য, সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ন্যায্য আলোচনা কিংবা কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীর সৃষ্টিমূলক রচনা প্রভৃতিতে প্রাসঙ্গিক উক্তিসমূহ সীমাহীনভাবে অশোভন না হলে আপত্তিজনক হয় না।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে গণতান্ত্রিক সমাজে বাক্‌স্বাধীনতা অতি প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য হলেও যেখানে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন বিদ্যমান সেখানে এই স্বাধীনতা নিশ্চয়ই নিয়ন্ত্রণযোগ্য।

নিরাপত্তা শব্দের আভিধানিক অর্থ আপদহীনতা। রাষ্ট্রকে বিপদ হতে মুক্ত রাখবার স্বার্থকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থ বলা যায়। এর একটি অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক দিক আছে।

সমাজতন্ত্রের প্রচার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা স্বার্থের পরিপন্থী নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, আমাদের সংবিধান নিজস্বভাবে একপ্রকার সমাজতন্ত্রের উদগাতা, মেহনতি জনতার বিপ্লব প্রচার করাও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অনুকূল, যদি সেই বিপ্লব সশস্ত্র না হয়।

(চ) **বাক্‌স্বাধীনতার ষষ্ঠ সীমাঃ** বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্টকারী কোন কিছু সমর্থনীয় নয়। বিদেশী গণ্যমান্য লোকদের সম্বন্ধে কদর্য উক্তি করা, যে রাষ্ট্র আমাদের রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্ররোচনা দেয়া প্রভৃতি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা যায়।

এই অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকার

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ১৮ ও ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদের সাথে এই অনুচ্ছেদের মিল

www.pathagar.com

রয়েছে। ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে"। ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রত্যেকেরই মতামতের ও মতামত প্রকাশের স্বাধিকার রয়েছে। বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং যেকোন উপায়াদির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদঃ ৪০

আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যেকোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যেকোন আইনসংগত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

ভাষ্য

এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে আইনসঙ্গত পেশা, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার, তবে এই অধিকার প্রথমতঃ আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এই অধিকার আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষ হবে।

প্রথমেই আইনসঙ্গত কথাটি বিবেচনা করা যাক। এই প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি মুনীর (তৎকালীন পাকিস্তানের) তার সংবিধানবিষয়ক পুস্তকে বলেছেন যে, আইনসঙ্গত কথাটির দ্বারা এই অধিকারটির মৌলিকত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ যদি কোন বৃত্তি বা ব্যবসায়কে আইন প্রণেতাগণ অন্যায়ভাবে বেআইনী ঘোষণা করেন তাহলে ঐ ঘোষণা রুখবার কোন পথ থাকে না এবং সেই কারণে অন্যায় আইন দ্বারা অযৌক্তিকভাবে একটি বৃত্তি বা ব্যবসায়কে বেআইনী ঘোষণা করে চিরতরে বন্ধ করা যায় এবং এই পরিস্থিতিতে অধিকারটি তার মৌলিকত্ব হারায়।

সে যাই হোক, কতিপয় বৃত্তি বা ব্যবসায় এতই সমাজবিরোধী যে, সেগুলি সঙ্গতভাবে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। জুয়া খেলা বা নারী ব্যবসায় এই জাতীয় বৃত্তির উদাহরণ।

অশ্লীল চিত্র বা পুস্তক বিক্রয় বা দল বেধে ছিনতাই করার পেশা সকল দেশেই বেআইনী ঘোষিত হয়েছে।তবে যে কাজ এককভাবে বেআইনী নহে সেই কাজের কারবারকে বেআইনী ঘোষণা করা যায় না। যে দেশে তামাকের ব্যবহার অর্থাৎ তাম্রকুট সেবন বা তাম্রধূম পান বেআইনী নয়, সে দেশে তামাকের কারবার বেআইনী ঘোষণা করা যায় না।

আইনসঙ্গত বলতে কি বুঝায় তা একটি কেসে প্রধান বিচারপতি কায়ানী বিশ্লেষণ করেছেন। আইনসঙ্গত বলতে বুঝায় ঃ (১) আইন অনুযায়ী (২) আইন বিরোধী নয় (৩) আইন অনুমোদিত (৪) আইন দ্বারা মঞ্জুরীকৃত অথবা আইনের বিষয়ীভূত। বারাঙ্গানার বৃত্তি আইনসঙ্গত কিনা সেই প্রশ্ন বিবেচনা করতে গিয়ে বিচারপতি বলেন, দ্বিতীয় অর্থে এই বৃত্তিকে আইনবিরোধী বলা যায় না।

www.pathagar.com

এই পর্যন্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম যে, বৃত্তি বা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার তাদের আইনানুগতা দ্বারা সীমায়িত। অর্থাৎ আইন যে বৃত্তিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে, কোনভাবে সেই বৃত্তি বা ব্যবসায়ে বাংলাদেশের নাগরিক নিয়োজিত হবার অধিকার রাখবে না। আইন যদি আজ মদের ব্যবসায়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তবে ঐ ব্যবসায় লিপ্ত হবার অধিকার আর কারও থাকবে না।

এখন দেখা যাক, যোগ্যতার বিষয়। সংবিধান বলছে যে, আইন পেশা, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায়ের জন্য যোগ্যতা নির্ধারিত করবে এবং ঘোষণা দিবে যে ঐ সব যোগ্যতা না থাকলে ঐ বিষয়ে লিপ্ত হওয়া যাবে না। আইন বলে দিতে পারে যে, ডাক্তারী করতে হলে তাকে এমবিবিএস পাশ করতে হবে এবং প্রাসাদ বানাবার কাজ করতে হলে তাকে প্রকৌশলী হতে হবে। প্রধান বিচারপতি মুনীর তার পুস্তকে বলেছেন যে, এই যোগ্যতা নির্ধারণের বিষয়টি আদালতে বিচারযোগ্য নহে।

সর্বশেষে আসে বাধা-নিষেধের কথা। এই অনুচ্ছেদে বাধা-নিষেধকে যে যুক্তিসঙ্গত হতে হবে এমন কথা বলা হয় নাই। সুতরাং পেশা, বৃত্তি, কারবার ও ব্যবসায় পরিচালনার ব্যাপারে অযৌক্তিক বাধা-নিষেধ আরোপিত হলে কারও কিছু বলবার নেই। প্রধান বিচারপতি মুনিম (বাংলাদেশের) তার পুস্তকে লিখেছেন ঃ সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মূলনীতি বলে গ্রহণ করা হয়েছে। সেই কারণে স্বাভাবিকভাবে বাধানিষেধকে "যুক্তিসঙ্গত" শব্দের প্রভাব হতে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং বরঞ্চ বাধানিষেধের পূর্বে "কোন" শব্দ স্থাপন করে বাধানিষেধ আরোপ করবার এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে এই অধিকারের মৌলিকত্বের চেহারা বেশী দেখতে পাওয়া যায় না। এই অধিকারের উপর তিন রকমের হস্তক্ষেপ আইনসঙ্গতভাবে করা যায় এবং এই হস্তক্ষেপ নস্যাৎ করবার কোন পথ সংবিধান রাখে নাই। প্রথম হস্তক্ষেপ হচ্ছে পেশা বা ব্যবসায়ের আইনানুগতা নির্ণয়।

সরকার যদি বলে দেয় যে, অতঃপর আর কেউ গরু কেনাবেচা করতে পারবে না; তবে দেশে গরু কেনাবেচা বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় হস্তক্ষেপ হচ্ছে যোগ্যতা নির্ধারণ। সরকার যদি ঘোষণা করে যে, কোন কবিরাজ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা করতে পারবে না; তবে কবিরাজী চিকিৎসা করা চলবে না। তৃতীয় হস্তক্ষেপ হচ্ছে বাধানিষেধ আরোপ। সরকার যেকোন বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে পেশার উপর বা কারবারের উপর। থানা হাসপাতালে দশ বছর কর্মরত না থাকলে কোন ডাক্তার শহরে প্র্যাকটিস করতে পারবে না। এইরূপ বাধানিষেধ আরোপ করা হলে তার জন্য কোন অভিযোগ টিকবে না।

তবে সংবিধান যতটুকু বলছে তাতে সকল নাগরিকের বৃত্তি নির্ধারণের ব্যক্তিগত অধিকার রয়েছে। যে ডাক্তার হতে চায় তাকে প্রকৌশলী বানানো যাবে না; তবে বৃত্তি গ্রহণ করবার পর বা কারবার আরম্ভ করবার পর তা পরিচালনা করতে হলে তৎসম্পর্কে আইন মান্য করে চলতে হবে। আবার নাগরিকের এমন অধিকার নেই যে, যত্রতত্র যেকোন কারবার করতে পারবে। ব্যবসায় করবার অধিকার আছে বলে বাসস্ট্যান্ডে সিগারেটের দোকান দেওয়ার অধিকার কারো নেই। কারবার বা ব্যবসায় করবার অধিকার আছে বলে সরকারের নিকট হতে সুবিধা পাবার

www.pathagar.com

অধিকার কারো নেই। কোন ব্যক্তি পুস্তক প্রকাশনার ব্যবসায় নেমে বলতে পারে না যে তার প্রকাশিত পুস্তকাবলী স্কুল-কলেজের পাঠ্য বিষয়ে স্থান দিতে হবে।

সর্বশেষে বলতে হয় যে, জনকল্যাণের স্বার্থে আইনের দ্বারা বৃত্তি বা ব্যবসায়ের উপর বাধানিষেধ আরোপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। জুয়ার আড্ডা বা শুঁড়িখানা বা নিষিদ্ধ ঔষধের ব্যবসায় আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। যারা শ্রমিক তারা যেন মালিকের নিকট হতে যুক্তিসঙ্গত বেতন পান এবং ছাঁটাই হলে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ পান এবং কারখানায় যাতে স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা থাকে, এইসব বিষয়ে আইন থাকা উচিত। রাস্তায় গাড়ী চালকদের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য, বাজারে মাল সরবরাহ নিশ্চিত করবার জন্য, মালের অপ্রতুলতার সময়ে ঐ মাল নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন থাকা উচিত। বাজারে ফড়িয়া নিয়ন্ত্রণ বা কালোবাজারী নিয়ন্ত্রণ বা দালালদের দৌরাত্ম্য নাশ করবার জন্য আইন থাকা উচিত। যে ব্যক্তি বা কারবার যেভাবে পরিচালিত হলে সাধারণ মানুষের ক্ষতি না হয় বা কোন বিপদ না ঘটে সে বিষয়ে আইনগতভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

অনুচ্ছেদঃ ৪১

(১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে–

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যেকোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

(২) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

ভাষ্য

এই অনুচ্ছেদে ধর্মীয় স্বাধীনতার যে মৌলিক অধিকার বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য সংবিধান সংরক্ষণ করেছে তা বর্ণিত হয়েছে। ধর্মীয় ব্যাপারে এই অনুচ্ছেদে তিনটি অধিকারের ঘোষণা দিয়েছে ঃ (১) প্রত্যেক নাগরিকের যেকোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার (২) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার এবং (৩) নিজস্ব ধর্ম সংক্রান্ত না হলে ধর্মীয় শিক্ষা, অনুষ্ঠান বা উপাসনালয়ে যোগদান না করার অধিকার। অবশ্য এই তিনটি অধিকার আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষ।

প্রথমেই বুঝে নেয়া প্রয়োজন, ধর্ম কি? সংবিধান ধর্মের কোন সংজ্ঞা দেয় নাই। সাধারণভাবে ধর্ম বলতে আমরা ইসলাম, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু প্রভৃতিকে ধর্ম বলি। কিন্তু এসবের বহিরঙ্গে কোনপ্রকার মৌলিক ঐক্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ঈশ্বরের প্রতি আস্থা যদি ধর্ম হয় তবে বৌদ্ধ বা জৈনদের ধর্মকে ধর্ম বলা যায় না; কারণ তারা নিরীশ্বরবাদী। একত্ববাদ যদি ধর্ম হয় তবে খ্রীস্টান এবং হিন্দুরা ধার্মিক একথা বলা যায় না। একজন প্রাচীন ইংরেজ দার্শনিকের উক্তি

www.pathagar.com

যে, ঈশ্বর উপাসক সকল মানুষই ধার্মিক একথা ঠিক নহে। তবে দার্শনিক মতবাদ আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়।

অষ্ট্রেলিয়ার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাথাম একটি কেসে বলেন, মানুষের ইতিহাসে ধর্ম সম্পর্কে ধারণার বিবর্তন প্রায় বৈপ্লবিক। ইউরোপিয়ানগণ মানুষের সহিত মহাপ্রভুর সম্পর্ককে ধর্ম মনে করেন। কিন্তু বৌদ্ধরা কোন মহাপ্রভুকে বিশ্বাস করে না। এমন অনেক ধর্ম আছে যারা বিশেষভাবে এবং বিশেষ ধরনের পোষাক পরে এবং বিশেষ নীতি অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করে এবং এইগুলিকে তারা ধর্ম বলে চিহ্নিত করে। সত্য বলতে কি, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজস্বভাবে তাদের ধর্মের উপাদান গড়ে নেয়। আদালতের পক্ষে এর কোন একটি উপাদানকে ধার্মিকতা না বলা শোভন নয়। এ্যানাব্যাপ্টিস্টগণ শপথ লয় না, আদালতে উপস্থিত হতে অস্বীকার করে, অস্ত্র ধারণা করে না এবং সকল সরকারকে খ্রীস্টবিরোধী মনে করে। এই সম্প্রদায়কে ধর্মহীন বলে মনে করা অনুচিত। জাপানের শিন্টো ধর্মে সম্রাটকে ঈশ্বর মনে করা হয়। কোরবানী বা পশু উৎসবও অনেক ধর্মের অংগ। এগুলির কোনটি ধর্ম বহির্ভূত কাজ বলে আদালত মনে করতে পারে না। অতঃপর বিচারপতি সাথাম বলেন, সকল ধর্মকে পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করতে গেলে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে না।

সুতরাং ধর্মের সংজ্ঞা আদালতেও পাওয়া গেল না। আমি মনে করি, যে দেশে যে মানব গুচ্ছকে যে ধর্মাবলম্বী মনে করা হয়, তারা সেই ধর্মাবলম্বী বা কোন ব্যক্তি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি সেই ধর্মাবলম্বী এবং যারা ঈশ্বরকে স্বীকার করে না, তাদেরও ধর্ম আছে।

ধর্ম সম্পর্কে আমার অভিমত নিবেদন করলাম। এখন সর্বপ্রথম অধিকারটি আলোচনা করা যাক। নামাজ পড়বার, পূজা করবার, গির্জায় যাবার বা নামাজ, পূজা বা প্রার্থনা প্রচার করবার অধিকার মৌলিক। তবে ধর্মীয় স্বাধীনতার এই অধিকার আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষ। ধর্মীয় কোন কর্ম যদি আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা ভঙ্গ করে তবে তা সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত হয় না। প্রাসঙ্গিক বোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীমকোর্টের সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দেয়া যায়। ঐ দেশে কোন নারী বা পুরুষ তাদের স্বামী বা স্ত্রী থাকতে পুনর্বার বিবাহ করতে পারে না। যদিও মরমন সম্প্রদায়ের ধর্মে বহু বিয়ে অনুমোদিত তবুও তারা বহু বিয়ের অনুমতি পায় নাই। এই প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্ট বলেন, মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অভিমত আদালতের উর্ধ্বে। কিন্তু উহা পালন করতে গিয়ে যে সকল কাজ করে তা আইনের উর্ধ্বে নয়। নরবলি কোন ধর্মে সিদ্ধ হলেও তা কোন সরকার স্বীকার করে নিতে পারে না। অতি প্রাকৃতিক বা আধিভৌতিক শক্তির দ্বারা রোগ নিরাময় করাও আইনের দ্বারা বন্ধ করা যেতে পারে। টিকা দেবার জন্য আইন করা যায়।

নিজেকে আঘাত করে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবার অধিকার কারও নাই। বাংলাদেশের সংবিধানে যে সকল মৌলিক অধিকার বিধৃত, সেইগুলি ধর্মীয় স্বাধীনতার অজুহাতে ভঙ্গ করা যায় না। ধর্মের ব্যাপারে বৈষম্য সংবিধানে নিষেধ আছে। বলবার কথা এই যে, যা একেবারে নিরীহ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, তাতে স্বাধীনতা সকলেরই আছে। হিন্দু পূজা আহ্নিক করবে, খৃষ্টান রবিবারে গীর্জায় যাবে এবং মুসলমান নামাজ পড়বে, এতে কেউ বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু এর বাইরে আর সব আইন জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার অধীন।

www.pathagar.com

এবার দ্বিতীয় অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। ধর্মীয় সম্প্রদায় বলতে সাধারণতঃ কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী লোকসমষ্টিকে বুঝায়। এই উপমহাদেশের উচ্চ আদালতসমূহের মতে, হিন্দুরা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং মুসলমানরা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। উপসম্প্রদায়-এর উদাহরণ দেয়া যায়। হিন্দুদের শাক্ত ও বৈষ্ণব দ্বারা এবং মুসলমানদের হানাফী ও শাফেয়ী দ্বারা ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং উপসম্প্রদায় সৃষ্টি হতে পারে। প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং উপসম্প্রদায়ের অধিকার আছে নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনের। মুসলমান ও হিন্দুরা ওয়াকফ ট্রাস্ট বা দেবোত্তরের মাধ্যমে নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও পরিচালনা করতে পারে। এবার দেখা যাক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারটি। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমানকে কোন হিন্দুর পূজায় বা হিন্দুকে কোন মুসলমানের মিলাদে অংশ গ্রহণ করতে বলা যাবে না। এই নিরাপত্তা শুধু সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য। তবে এই অধিকার আইন জনশৃংখলা ও নৈতিকতার অধীন।

ধর্মীয় স্বাধীনতা আইনের অধীন, ইহা বলার অর্থ কি? ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে হলে তা আইনের মাধ্যমে করতে হবে। নির্বাহী আদেশ দ্বারা ধর্মীয় ব্যাপারে কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায় না। তবে যে আইন দ্বারা এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে তা সংবিধানের বিধান অনুযায়ী জারিকৃত হতে হবে এবং সংবিধানের এই অধ্যায়ে বর্ণিত অন্যান্য মৌলিক অধিকারের অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন করা যাবে না। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে রাষ্ট্র আইন করতে পারবে। ওয়াকফ আইন ইহার একটি উদাহরণ।

জনশৃংখলার স্বার্থে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মহররমের সময় তাজিয়াসহ মিছিল করা নিঃসন্দেহে একটি ধর্মীয় অধিকার। কিন্তু এটা জনশৃঙ্খলার কারণে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আইন দ্বারা অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে সরকার বলে দিতে পারবে কোন্ পথে মিছিল চলবে। পূজার সময় হিন্দুরা বাজনা বাজাবার অধিকার রাখে এবং বাজনাসহ তারা মিছিলও করতে পারবে। কিন্তু জনশৃঙ্খলার কারণে ঐ মিছিলকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে জনগণের মধ্যে নিরাপত্তার ভাব জাগ্রত করা। নানা প্রকার এবং বিভিন্ন ধরনের আইনের মাধ্যমে তারা জনশৃঙ্খলা রাখার প্রয়াস পায়। জনশৃঙ্খলার মধ্যে জননিরাপত্তা ও জনস্বার্থ অন্তর্ভুক্ত। জনশৃঙ্খলা নষ্ট করে বা খর্ব করে বা ভঙ্গ করে এমন কিছু কাজ ধর্মের অনুমোদনে হলেও তা নিয়ন্ত্রণযোগ্য। আমার ধর্ম ভাল-এটা বলতে দোষ থাকার কথা নয় কিন্তু অন্য ধর্ম একেবারেই তুচ্ছ সুতরাং অবজ্ঞেয় এমন ঘোষণা আইনসঙ্গত নয়। ধর্মীয় স্বাধীনতা নৈতিকতার স্বার্থেও নিয়ন্ত্রণযোগ্য। নৈতিকতার সাথে শালীনতার যোগ অবিচ্ছেদ্য। নারী-পুরুষের অবাধ মিলন, দিগম্বর অবস্থায় বিচরণ প্রভৃতি যদি ধর্মগতভাবে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুমোদিত হয় তবু তাও আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। প্রধান বিচারপতি মুনিম তার পুস্তকে বলেছেনঃ ধর্মীয় কাজ-কর্ম যতক্ষণ না পর্যন্ত জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার বিরোধী না হয়, নিষিদ্ধ করা যাবে না, এবং যেহেতু বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়েছে সেহেতু বাংলাদেশে ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের প্রার্থনাপদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। যে সময় বিচারপতি ইহা লিখেছিলেন, সে সময়ের সংবিধানে বিবর্তন আনা হয় নাই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, ধর্মনিরপেক্ষ নীতি প্রত্যাহৃত হয়ে তৎপরিবর্তে আল্লাহর প্রতি আস্থা

www.pathagar.com

স্থাপন প্রতিস্থাপিত হবার পর রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হতে পারে কিনা।

আমি এ বিষয়ে কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদের সাথে আলোচনা করেছি। তারা বলেছেনঃ আল্লাহর উপর আস্থার সাথে ধর্মীয় স্বাধীনতার কোন বিরোধ নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমান থাকতে পারে এবং তারা তাদের ধর্ম অবলম্বন এবং পালন করতে পারে এবং নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে এবং নিজস্ব ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তারা আরও বলেছেন, ধর্ম প্রচারের অধিকার নিয়ে কেউ কেউ তর্ক তুলতে পারেন কিন্তু অধিকাংশ আলেমগণ একমত যে, ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের কথা বলবার, পুস্তক রচনা ও ছাপাবার এবং ধর্মীয় সভা প্রভৃতি করবার অধিকার অস্বীকার করে নাই।

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে ধর্মের কারণে সকল প্রকার বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে; ২৯ অনুচ্ছেদে সরকারী কর্মে নিয়োগের ব্যাপারে ধর্মের কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে; ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। এইসব অনুচ্ছেদের সহিত ৪১ অনুচ্ছেদ মিলিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখবার সকল প্রকার নিশ্চিতি বিদ্যমান রয়েছে।

এই অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকার

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদের সাথে এই অনুচ্ছেদের মিল রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, "প্রত্যেকের চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। নিজ ধর্ম অথবা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতা এবং একা অথবা অপরের সাথে মিলিতভাবে ও প্রকাশ্যে বা গোপন নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস শিক্ষাদান প্রচার উপাসনা বা পালনের মাধ্যমে প্রকাশ করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ ৪২

(১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলিব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ, কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় বা প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নিদিষ্ট করা হইবে, তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৩) ১৯৭৭ সালের ফরমানসমূহ (সংশোধন) আদেশ (১৯৭৭ সালের ১নং ফরমানসমূহ আদেশ) প্রবর্তনের পূর্বে প্রণীত কোন আইনের প্রয়োগকে, যতদূর তাহা ক্ষতিপূরণ ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের সহিত সম্পর্কিত—এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

www.pathagar.com

ভাষ্য

সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে সম্পত্তির বিষয়ে নাগরিকদের অধিকার দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে সম্পত্তি অর্জন করা, ধারণ করা, হস্তান্তর করা এবং অন্যভাবে বিলিব্যবস্থা করার। তবে এই অধিকার আইনের দ্বারা বাধানিষেধের অধীন।

সম্পত্তি অর্জন ও ধারণের অধিকার নিরংকুশ হতে পারে না। সমাজে বাস করতে হলে কোন অধিকারই বাধাহীন ভাবে পাওয়া যায় না; সবার ও দেশের স্বার্থের সাথে সমঞ্জস করে অধিকার ভোগ করতে হয়। অন্যের পক্ষে বিপদজনক হতে পারে, অন্যের ক্ষতি হতে পারে, এমন সম্পত্তি ধারণ বা ভোগ করা চলে না।

আইনের দ্বারা নাগরিকের সম্পত্তির উপর বাধানিষেধ আরোপ করা যায়। সংবিধানে এমন কথা নেই যে, আইনকে যুক্তিসঙ্গত হতে হবে, সুতরাং সম্পত্তির অধিকার যদি আইন খর্ব করে তবে একথা বলা যাবে না যে, আইন অত্যন্ত কড়া, নিষ্ঠুর বা অযৌক্তিক অন্যায্য। সংবিধানের অন্য অনেক বিধানে যুক্তিসঙ্গত শব্দটির ব্যবহার আছে; এই বিধানে নাই। সংবিধানে সম্পত্তির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। সম্পত্তি বলতে স্থাবর, অস্থাবর, বস্তুগত ও নিবর্স্তুগত সকল প্রকার সম্পত্তি, বাণিজ্যিক ও শিল্পগত উদ্যোগ এবং অনুরূপ সম্পত্তি বা উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোন স্বত্ব অন্তর্ভুক্ত।

যেহেতু সম্পত্তির অধিকার আইনের মাধ্যম ছাড়া বাধাপ্রাপ্ত হবে না তাই কোন নির্বাহী হুকুম দ্বারা এই অধিকারকে খর্ব, হ্রাস বা বিনষ্ট করা যায় না। যখন সম্পত্তির স্বত্ব-স্বামিত্ব একজন থেকে চ্যুত হয়ে অন্যজনে বর্তায় তখনই দ্বিতীয়জন সম্পত্তি অর্জন করে। ক্রয়, দান, মিরাস, প্রভৃতি দ্বারা এবং আদালতে নিলাম, ডিক্রী প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জিত হয়।

নিজের ইচ্ছেমত আইনসম্মতভাবে সম্পত্তি ভোগ করা এবং ব্যবহার করাকে সম্পত্তি ধারণ করা বলে। সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য সম্পত্তি ধারণের পরিপন্থী নয়।

বিষাক্ত ওষুধ, মদ, আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ নিয়ন্ত্রণমূলক আইন করা যায়। আমদানী ও রপ্তানী বিশেষ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করা যায়। ইমারত প্রভৃতি নির্মাণ করবার ব্যাপারে বিধি প্রণয়ন করে পৌরসভা বা টাউন প্লানিং সংস্থাসমূহ শহরের জনস্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষার জন্য নাগরিকদের জমি ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। কর সম্পর্কীয় আইন প্রণয়ন করে ভাড়াটিয়াদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য বাড়ির মালিকের অধিকার বাধানিষেধের আওতায় আনা যায়। একশ বা ষাট বিঘার বেশী জমি কেউ রাখতে পারবে না, বর্গাদারকে কেউ উৎখাত করতে পারবে না প্রভৃতি আইন সংবিধানে সিদ্ধ।

আইনের মাধ্যম ব্যতীত অর্থাৎ আইন না করে কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়াত্ত বা দখল করা যাবে না।

রাষ্ট্র যখন কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে চাইবেন বা দখল করতে চাইবেন, তখন দখল বা গ্রহণের পূর্বেই রাষ্ট্রকে আইন প্রণয়ন করে নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ যে স্থানে নির্বাহী বিভাগকে সম্পত্তি গ্রহণ করবার অধিকার প্রদত্ত হয়েছে বা যে স্থলে যে কার্যবিধির বিধান করা হয়েছে তা নির্বাহী বিভাগ অনুসরণ না করলে গ্রহণ অবৈধ হবে। আইন দ্বারা সরকার কর্তৃক কোন সম্পত্তি গৃহীত হলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ চলে না।

রাষ্ট্র যদি নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন এবং হস্তান্তর প্রভৃতির জন্য কিংবা সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়াত্ত এবং দখল করার জন্য আইন প্রণয়ন করে তবে সে আইনে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং তার পরিমাণ নির্ধারণের ব্যবস্থা থাকতেই হবে, কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয়ের নীতি ও পদ্ধতি থাকতে হবে।

www.pathagar.com

এই অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকার

এই অনুচ্ছেদের সঙ্গে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদের মিল রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, " (ক) প্রত্যেকরই একাকী ও অপরের সহযোগিতায় সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে। (খ) কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়াল–খুশী মত বঞ্চিত করা যাবে না।"

অনুচ্ছেদঃ ৪৩

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের–

(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার থাকিবে; এবং

(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকিবে।

ভাষ্য

বাংলাদেশের সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে–

ক. আপনগৃহে নিরাপদে থাকবার,
খ. আপনগৃহে কাউকে প্রবেশ করতে না দিবার,
গ. আপনগৃহে তল্লাশী করতে না দেবার,
ঘ. আপনগৃহে আটক না হওয়ার,
ঙ. চিঠিপত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখার এবং
চ. অন্যভাবে অন্যের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করার।

এই অধিকারগুলো কিছু বাধানিষেধের অধীন। তবে সেই বাধানিষেধ–

ক. যুক্তিসঙ্গত হতে হবে, এবং
খ. আইনের দ্বারা আরোপিত হতে হবে, এবং
গ. রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে হতে হবে, এবং
ঘ. জনশৃঙ্খলার স্বার্থে হতে হবে, এবং
ঙ. জনসাধারণের নৈতিকতার স্বার্থে হতে হবে, বা
চ. জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে হতে হবে।

এই অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকার

এই অনুচ্ছেদের সঙ্গে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ১২ নম্বর অনুচ্ছেদের মিল রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, " কাউকে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ী বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল–খুশীমত হস্তক্ষেপ অথবা সম্মান ও সুনামের উপর আক্রমণ করা চলবে না।"

অনুচ্ছেদঃ ৪৪

(১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।

www.pathagar.com

ভাষ্য

মৌলিক অধিকার ভঙ্গ হলে সরকারের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা করা যায়; এটা এই অনুচ্ছেদের বিধান। মৌলিক অধিকার কাকে বলে এবং কোন কোন অধিকার মৌলিক এ সম্পর্কে শুরুতেই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। যেসব অধিকার মৌলিক অধিকার রূপে সংবিধানে বর্ণিত হয়নি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৌলিক, সেগুলো ভঙ্গ হলেও হাইকোর্টে মামলা করা যায়। এই প্রকার অধিকারকে স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের অধিকার বলা হয়। ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও এই উপমহাদেশের উচ্চআদালতসমূহে ঐ অধিকারের স্বীকৃতি আছে।

বিবেকপ্রসূত যুক্তি অনুযায়ী বিচার প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক ন্যায়বিচার বলে। ন্যায়বিচারের নীতিগুলো কয়েকটি সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলো হচ্ছে নিম্নরূপঃ

এক. নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কেউ নিজেই নিজের বিচারক হতে পারে না। বিচারকালে কোন প্রকার পক্ষাপতিত্ব করার সুযোগ থাকবে না অথবা বিচারকের বিচারে নিরপেক্ষ ভূমিকা সম্বন্ধে আদৌ কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

দুই. বক্তব্য পেশের সুযোগ না দিয়ে অথবা বক্তব্য শ্রবণ না করে কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত করা ন্যায়সঙ্গত নয়। উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই ন্যায়পরতা। ন্যায়বিচারের সম্বন্ধে এই মৌলিক ধারণার বিষয়ে কোন স্পষ্টতার অবকাশ নেই।

বিচারপতি চানেল রবিনসন্স-বনাম ফেনার-এর মামলায় মন্তব্য করেন, "বিচারে স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের পরিপন্থী কোন প্রক্রিয়ায় রায় দেয়া হলে, তা আইনত বলবৎযোগ্য নয়।" এই মূল্যবান সূত্রটি বিশ্বের আদালতসমূহ ন্যায়বিচারের নির্দেশ রূপে উদ্ভাবন করেন যেন তা বিচার নিষ্পত্তির কাজে স্পষ্টত ঃ অনুসৃত হয়। প্রফেসার সোয়ার্জ এটাকে আইনানুগ নৈতিক ধ্যানধারণা বলে উল্লেখ করেন।

আইন শব্দটি শুধুমাত্র বিধিবদ্ধ আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিচারের যাবতীয় নীতি বা প্রক্রিয়ায় এটা প্রযোজ্য। আমেরিকার সংবিধানে বর্ণিত 'আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া' উক্তিটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ম্যাক্সওয়েল আইনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিচার বিভাগের যাবতীয় কার্যক্রমে একে আইনের মূলনীতি রূপে গণ্য করার সুপারিশ করেন।

বস্তুতঃ এই অনুচ্ছেদটি মূলতঃ মৌলিক অধিকারের রক্ষাকবচ। সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষা করার জন্যই এই অনুচ্ছেদ সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

এই অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকার

সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের সাথে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ৮ নম্বর অনুচ্ছেদের মিল রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "যে কার্যাদির ফলে শাসনতন্ত্র বা আইন কর্তৃক প্রদত্ত মৌল অধিকারসমূহ লঙ্ঘিত হয় সে সবের জন্য উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালতের মারফত কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।"

প্রাসঙ্গিক বিধায় সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদও এখানে সন্নিবেশিত হলঃ

অনুচ্ছেদঃ ১০২

(১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যেকোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যেকোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন।

(২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্যকোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই তাহা হইলে—

www.pathagar.com

(ক) যেকোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে–

(অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থায়ী কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যেকোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত হয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া; অথবা

(আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যেকোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে ও তাহার কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশ দান করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) যেকোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে–

(অ) আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে সেই জন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) কোন সরকারী পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অনুষ্ঠানের দাবী করিতেছেন তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশ দান করিতে পারিবেন।

(৩) উপরিউক্ত দফাসমূহে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয় এরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন অন্তর্বর্তীকালীন বা অন্য কোন আদেশ দানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের থাকিবে না।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের (২) দফার উপদফার অধীন কোন আবেদনক্রমে যে ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী আদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং অনুরূপ অন্তর্বর্তী আদেশ –

(ক) যেখানে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন ব্যবস্থার কিংবা কোন উন্নয়নমূলক কার্যের প্রতিকূলতা বা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, অথবা

(খ) যেখানে অন্য কোনভাবে জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে,

সেখানে অ্যাটর্নি জেনারেলকে উক্ত আবেদন সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত নোটিশ দান এবং অ্যাটর্নি জেনারেলের (কিংবা এই বিষয়ে তাহার দ্বারা ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন এডভোকেটের) বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত এবং এই দফার (ক) বা (খ) উপদফায় উল্লেখিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না বলিয়া হাইকোর্ট বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিভাগ কোন অন্তর্বর্তী আদেশ দান করিবেন না।

(৫) প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে ব্যক্তি বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগসমূহ বা কোন শৃঙ্খলা বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যেকোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।

এই অনুচ্ছেদের গুরুত্ব

আমরা ২৬ অনুচ্ছেদ আলোচনাকালে দেখেছি যে, সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলো এতই সার্বভৌম এবং শক্তিশালী যে,এগুলোর পরিপন্থী সকল আইন এবং আদেশ চূড়ান্তভাবে বৈধ।এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে নির্ধারণ করবে যে, সংসদীয় আইন বা নির্বাহী আদেশ

www.pathagar.com

মৌলিক অধিকারী হওয়ায় অবৈধ? সংসদ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয় এবং সে কারণে সংসদের অধিকার থাকা উচিত তাদের বিবেচনায় যেকোন আইন পাশ করার। জনগণ তাদেরকে আইন প্রণয়নের জন্য সংসদে পাঠিয়েছে এবং সে কারণে এ কথা বলা যায় যে, সংসদে প্রণীত আইন জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন।

সংসদ সদস্যগণ যে আইন প্রণয়ন করেন সেই আইনে সংসদ সদস্যদের অভিপ্রায়ের প্রতিফলন ঘটে; কিন্তু সব সময় যে তাদের অভিপ্রায় ভাবাবেগের উর্ধ্বে হবে এমন নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। সংবিধান তাই একগুচ্ছ নীতিমালা জারি করেছে মৌলিক অধিকারের নামে। এবং নির্দেশ দিয়েছে, এই নীতিমালার মধ্যে থেকেই আইন প্রণয়ন করতে হবে। এবং সুপ্রীম কোর্টের উপর দায়িত্ব দিয়েছে সংসদীয় আইন ঐ নীতিমালার মধ্যে পড়ে কিনা তা দেখবার। এই ব্যবস্থা না থাকলে মৌলিক অধিকারের ভিতরে থেকে যে সংসদীয় ও নির্বাহী কর্মকান্ড চলছে তা নির্ণয় করবার কেউ থাকতো না।

– আইনের শাসনের অর্থ শুধু আইনের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হবে এমন নয়, বরং এর অর্থ হচ্ছে এই প্রযুক্ত আইন সংবিধানসম্মত কিনা তাও দেখা। এই কাজ করতে পারে সুপ্রীম কোর্ট।

এই অনুচ্ছেদের গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

অনুচ্ছেদঃ ৪৫

কোন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যেকোন বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধান বলিয়া অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

ভাষ্য

সেনাবাহিনী বা পুলিশ বা ঐশ্রেণীর শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সম্পর্কে শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার কার্যকরী হবে না।

সেনাবাহিনী বা পুলিশ বাহিনী এমন কাজে লিপ্ত, যে কাজে শৃঙ্খলা রক্ষার এবং কর্তব্যপালনের ব্যাপারে সামান্যতম অবহেলা বা শিথিলতা দেশ ও দশের জন্য মারাত্মক বিপর্যয়, দুর্দশা ও সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। দেশকে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বৈদেশিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা, মুক্ত ও নিরাপদ রাখবার বৃহত্তর স্বার্থে কর্তব্য পালন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে এই বাহিনীকে মৌলিক অধিকার থেকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন।

মৌলিক অধিকার সকল নাগরিকের উপর প্রযোজ্য। শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকেরাও বাংলাদেশের নাগরিক। তবুও দুটি ক্ষেত্রে তাদের মৌলিক অধিকার নেই। এর একটি কর্তব্য পালনের ক্ষেত্র, অপরটি শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্র। এই দুই ব্যাপারে যেকোন শৃঙ্খলামূলক আইন সংসদ প্রণয়ন করতে পারেন, মৌলিক অধিকার তাতে বাধ সাধবে না।

শৃঙ্খলামূলক আইন ব্যতীত অন্যসব আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য হলেও মৌলিক অধিকারের অধীন।

অনুচ্ছেদঃ ৪৬

এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যেকোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দন্ডাদেশ, দন্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্যকোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন।

www.pathagar.com

ভাষ্য

কোন সরকারী কর্মচারী বা অন্য কোন ব্যক্তি, যখন মুক্তিসংগ্রাম চলছিল তখন সে সংগ্রামের প্রয়োজনে যদি এমন কোন কাজ করে থাকেন যাতে তার উপর দায় বর্তাতে পারে তবে সংসদ আইনের মাধ্যমে সে কার্য দ্বারা কারও মৌলিক অধিকার ভঙ্গ হয়ে থাকলে তাকে দায়মুক্ত করতে পারবেন। তৎকালে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি শৃঙ্খলা রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রশ্নে যদি কার্য করে থাকেন যাতে তার উপর দায় বর্তায়, সে ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে কারও মৌলিক অধিকার ভঙ্গ হয়ে থাকলে সংসদ আইনের দ্বারা তাকে দায়মুক্ত করতে পারবেন। এবং তাদের দ্বারা আদিষ্ট দন্ড বা বাজেয়াপ্তি বা অন্য কার্যকে অনুরূপভাবে আইনের দ্বারা বৈধ করে নিতে পারবেন।

সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের জনগণ ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করেছে।

জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংবিধানে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত সত্য। স্বভাবতঃ সংগ্রামের সময় দেশের স্বার্থের প্রয়োজনে বা শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে এমন অনেক ব্যবস্থা বা কার্য করতে হয়েছিল যা সাধারণ আইনের সূক্ষ্ম বিচারে বিধিবহির্ভূত বলা যেতে পারে। যারা এ সমস্ত বিধি বহির্ভূত ব্যবস্থা পরিচালনা করেছিলেন তারা আইনের মাধ্যমে কৃতজ্ঞ দেশবাসীর নিকট হতে দায়মুক্তির আশা করতে পারেন। এ অনুচ্ছেদে সে বিধান করা হয়েছেঃ

ক. জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনে।

খ. বাংলাদেশের যেকোন অঞ্চলের শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে।

গ. বাংলাদেশের যেকোন অঞ্চলের শৃঙ্খলা পুনর্বহালের প্রয়োজনে।

সংসদ আইনের দ্বারা বৈধ করে নিতে পারবেন–

ক. দন্ডাদেশকে

খ. দন্ডকে

গ. বাজেয়াপ্তির আদেশকে

ঘ. অন্য কোন কার্যকে।

যদি এ চার প্রকার কাজ করা হয়ে থাকে উপরোক্ত তিন প্রয়োজনে যথা মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে, শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে এবং শৃঙ্খলা পুনর্বহালের প্রয়োজনে।

উপরোক্ত সীমার বাইরে কোন কার্যের জন্য দায়মুক্তি সিদ্ধ হবে না। ব্যক্তিগত বা দলগত দুষ্ট স্বার্থের জন্য কৃতকর্মের দায়মুক্তির বিধান সংবিধানে নেই।

অনুচ্ছেদঃ ৪৭

(১) নিম্নলিখিত যেকোন বিষয়ের বিধান সংবলিত কোন আইনে (প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে) সংসদ যদি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোন একটিকে কার্যকর করিবার জন্য অনুরূপ বিধান করা হইল, তাহা হইলে অনুরূপ আইন এই ভাগে নিশ্চয়কৃত কোন অধিকারের সহিত অসমঞ্জস কিংবা অনুরূপ অধিকার হরণ বা খর্ব করিতেছে, এই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে নাঃ

(ক) কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল বিংবা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা;

(খ) বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ উদ্যোগসম্পন্ন একাধিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সংযুক্তকরণ;

(গ) অনুরূপ যেকোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও কর্মচারীদের অধিকার এবং (যেকোন প্রকারের) শেয়ার ও স্টকের মালিকদের ভোটাধিকার বিলোপ,

www.pathagar.com

পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) খনিজদ্রব্য বা খনিজ তৈল অনুসন্ধান বা লাভের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) অন্যান্য ব্যক্তিকে অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ পরিহার করিয়া সরকার কর্তৃক বা সরকারের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীন বা ব্যবস্থাধীন কোন সংস্থা কর্তৃক যেকোন কারবার, ব্যবসায়, শিল্প বা কর্মবিভাগ চালনা; অথবা

(চ) যেকোন সম্পত্তির স্বত্ব কিংবা পেশা, বৃত্তি কারবার বা ব্যবসায় সংক্রান্ত যেকোন অধিকার কিংবা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কোন বাণিজ্যিক বা শিল্পগত উদ্যোগের মালিক বা কর্মচারীদের অধিকার বিলোপ,পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ।

(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রথম তফসিলে বর্ণিত আইনসমূহ (অনুরূপ আইনের কোন সংশোধনীসহ) পূর্ণভাবে বলবৎ ও কার্যকর হইতে থাকিবে এবং অনুরূপ যেকোন আইনের কোন বিধান কিংবা অনুরূপ কোন আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী এই কারণে বাতিল বা আইনী বলিয়া গণ্য হইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অনুরূপ কোন আইনকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না।

(৩) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দন্ডদান করিবার বিধান সংবর্ণিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

ভাষ্য

এই অনুচ্ছেদে কতিপয় আইনের হেফাজত বিধান করা হয়েছে। যে আইন বা যে আইনের কিছু অংশ সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস সেই আইন বা সেই অংশ বাতিল গণ্য হবে; সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদে এই ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমান অনুচ্ছেদ তার ব্যতিক্রম।

সাধারণতঃ সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারকে হরণ বা খর্ব করে এমন আইন বাতিল বলে ঘোষিত হবার যোগ্য। বর্তমান অনুচ্ছেদ তার ব্যতিক্রম।

সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হবে–

(ক) আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস,
(খ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচারের অর্থে সমাজতন্ত্র,
(গ) গণতন্ত্র ও মানবাধিকার,
(ঘ) ধর্মীয় স্বাধীনতা,
(ঙ) রাষ্ট্রীয় সমবায়ী ও সীমিত ব্যক্তিগত মালিকানা,
(চ) কৃষক শ্রমিকের মুক্তি,
(ছ) মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা,
(জ) গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব,
(ঝ) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা,

www.pathagar.com

(ঞ) জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা,
(ট) সুযোগের সমতা,
(ঠ) অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম,
(ড) নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য,
(ঢ) নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ,
(ণ) জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষা,
(ত) জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি সংরক্ষণ,
(থ) আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন।

রাষ্ট্রপরিচালনার এই মূলনীতিসমূহের কোন একটিকে কার্যকর করবার জন্য সংসদ তা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যদি কোন আইন নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে প্রণয়ন করেন, তবে সে আইন সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যের কারণে কিংবা মৌলিক অধিকার হরণ বা খর্ব হবার কারণে বাতিল গণ্য হবে না।

যে বিষয়সমূহে আইন করিবার অবাধ অধিকার প্রদত্ত হয়েছে তাদের সংখ্যা ছয়।

(ক) কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল কিংবা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা।

১৯৫০ সালের পূর্ববাংলা জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫১ সালের ২৮ নং আইন; ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ আদেশ), অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ১৯ নং আদেশ) প্রভৃতি এ দফার আওতায় আসে।

(খ) বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ উদ্যোগসম্পন্ন একাধিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সংযুক্তকরণ।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক (রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি, ও নং ২৬), ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ জলযান কর্পোরেশন (১৯৭২ সালের পি, ও নং ২৮) প্রভৃতি এ দফার আওতায় আসে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির সম্মিলন ঘটাতে পারলে কোন ব্যক্তি বা দলের স্বার্থহানি সত্ত্বেও বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হয়। এই কারণে ব্যাংকসমূহকে একত্র করে বিভিন্ন নামের নতুন ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে।

(গ) অনুরূপ যেকোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও কর্মচারীদের অধিকার এবং (যেকোন প্রকারের) শেয়ার ও স্টকের মালিকদের ভোটাধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;

ক-দফায় রাষ্ট্রায়ত্তকরণের কথা বলা হয়েছে। খ-দফায় সংযুক্তিকরণের কথা আছে। এই দুই দফার পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান দফার প্রয়োজন। রাষ্ট্রায়ত্ত ও সংযুক্তির পর প্রতিষ্ঠানের পূর্বতন ব্যবস্থাপনায় জড়িত ব্যক্তিদের অধিকার পূর্বানুরূপ থাকা স্বাভাবিক নহে।

(ঘ) খনিজ দ্রব্য বা খনিজ তৈল অনুসন্ধান বা লাভের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ।

খনিজ সম্পত্তি দেশের জাতীয় সম্পত্তি। অবশ্য সে সম্পত্তি আবিষ্কার ও উদ্ধার অতি দুরূহ, ব্যয়সাপেক্ষ এবং সময়সাপেক্ষ। এ অধিকার বিলোপ কিংবা অন্যভাবে নিয়ন্ত্রণ তাই রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির পরিপূরক।

(ঙ) অন্যান্য ব্যক্তিকে অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ পরিহার করে সরকার কর্তৃক বা সরকারের নিজস্ব, নিয়ন্ত্রণাধীন বা ব্যবস্থাপনাধীন কোন সংস্থা কর্তৃক যেকোন কারবার, ব্যবসায়, শিল্প বা কর্মবিভাগ চালনা।

দেশের স্বার্থে রাষ্ট্রায়ত্ত না করেও সরকার প্রতিষ্ঠানকে আপন পরিচালনায় গ্রহণ করতে পারেন। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ) আদেশ এ দফার আওতায় আসে।

(চ) যেকোন সম্পত্তির স্বত্ব কিংবা পেশা, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায় সংক্রান্ত যেকোন

www.pathagar.com

অধিকার কিংবা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কোন বাণিজ্যিক বা শিল্পগত উদ্যোগের মালিক বা কর্মচারীদের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ।

প্রথম তফসিলে নিম্নবর্ণিত আইনসমূহ বর্ণিত আছে। ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫০ সালের আইন নং ২৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বগ্রহণ) আদেশ (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের আদেশ নং ১)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (কর্মবিভাগসমূহ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ৯)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ১০)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (উদ্বাস্তু সম্পত্তি পুনরুদ্ধার) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ১৩)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী (অবসরগ্রহণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ১৪)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও বিলি ব্যবস্থা) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও. নং ১৬)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক (রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি ও নং২৬)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিল্পোদ্যোগ (রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ পি ও নং ২৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ জলযান কর্পোরেশন আদেশ (১৯৭২ সালের পি ও নং ২৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (সম্পত্তি ও পরিসম্পৎ ন্যস্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি ও নং ২৯)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ বীমা (জরুরী বিধানাবলী) আদেশ (১৯৭২ সালের পি ও নং৩০)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য সরবরাহ আদেশ (১৯৭২ সালের পি ও নং ৪৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ তফসিলভুক্ত অপরাধ (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (১৯৭২ সালের পি ও নং ৫০)।

১৯৭২ সালের রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী সংগঠনসমূহ (কর্মচারীদের বেতন নিয়ন্ত্রণ) (১৯৭২ সালের পি ও নং ৫৪)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পাট রপ্তানী সংস্থা আদেশ (১৯৭২ সালের পি ও নং ৫৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন পর্ষদসমূহ আদেশ (১৯৭২ সালের পি ও নং ৫৯)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (সার্ভিসেস স্ক্রিনিং) আদেশ (১৯৭২ সালের পি ও নং৬৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার হাট ও বাজার (ব্যবস্থাপনা) আদেশ (১৯৭২ সালের পি ও নং ৭৩)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার ও আংশিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (কর্মচারীদের বেতন নিয়ন্ত্রণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি ও নং ৭৯)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ বীমা (রাষ্ট্রায়ত্তকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি ও নং ৯৫)।

১৯৭২ সালের ভূমি জিরাত(সীমাবদ্ধকরণ) আদেশ (১৯৭২ সালের পি ও নং ৯৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ বিমান আদেশ (১৯৭২ সালের পি ও নং ১২৬)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ (১৯৭২ সালের পি ও নং ১২৭)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা আদেশ (১৯৭২ সালের পি ও নং ১২৮)।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক আদেশ (১৯৭২ সালের পি ও নং ১২৯)।

এবং রাষ্ট্রপতির আদেশসহ প্রচলিত আইনের দ্বারা কৃত উপরিউক্ত আইন ও আদেশসমূহের

www.pathagar.com

সকল সংশোধনী। এই সমস্ত আইন যদি সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, যদি তারা মৌলিক অধিকারকে হরণ, খর্ব বা হ্রাস করে তবুও এ দফার ক্ষমতা বলে তারা পূর্ণরূপে কার্যকর থাকবে– এই সমস্ত আইনের বা আইনের কোন অংশের কার্যকারিতা কিছুতেই ক্ষুণ্ন হবে না। এ সমস্ত আইনের অধীনে কৃত বা অকৃতকার্য কোন কারণে দূষিত ঘোষিত হবে না। তবে একটি শর্ত আছে। এ সমস্ত আইন পরিবর্তন বা রদ করিবার ক্ষমতা সংসদের আছে।

সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বা দফা বা অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা রদ করতে হলে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন পড়ে; কিন্তু উপরোক্ত আইনসমূহের যদিও তারা সংবিধানে রক্ষিত, পরিবর্তন সাধারণভাবে করা যাবে; দুই তৃতীয়াংশ সমর্থনের প্রয়োজন পড়বে না।

এই দফা "সংবিধান (প্রথম সংশোধন) আইন ১৯৭৩" দ্বারা এবং অবিলম্বে বলবৎ হয়েছে। ইহা ১৯৭৩ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে সংবিধানে সংযুক্ত হয়েছে।

এ দফা যাদের উপর প্রযোজ্য তারা হচ্ছেন–

(ক) সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য,

(খ) প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য,

(গ) সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা

(ঘ) যুদ্ধবন্দী;

উপর্যুক্ত ব্যক্তিগণের উপর এই দফা নিম্নবর্ণিত অপরাধ করলে প্রযোজ্যঃ

(ক) গণহত্যাজনিত অপরাধ,

(খ) মানবতা বিরোধী অপরাধ,

(গ) যুদ্ধাপরাধ,

(ঘ) আন্তর্জাতিক আইনের অন্যান্য অপরাধ;

উপর্যুক্ত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সংসদ আইন করতে পারবেন–

(ক) আটক করার আইন,

(খ) ফৌজদারীতে সোপর্দ করার আইন,

(গ) দন্ডদানের আইন,

এবং উপযুক্ত আইন সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যের কারণে বাতিল বলে গণ্য হবে না।

সংবিধানের প্রথম তফসিলে রাষ্ট্রপতির কয়েকটি আদেশ বর্ণিত আছে। এই আদেশগুলো সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে জারি হয়েছিল।

এ সমস্ত প্রাক–সাংবিধানিক আইন রক্ষা করবার প্রয়োজন ছিল। অন্যথায় এ আইন বা আদেশগুলি যোগ্যতা বহির্ভূত ঘোষিত হতে পারে। দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের আইনের সহিত এ সমস্ত আদেশের কিছু কিছু বিধানের অসামঞ্জস্য হতে পারে বিধায় বিজ্ঞ সংবিধান প্রণেতাগণ এ সমস্ত আদেশ সম্পর্কে এ অনুচ্ছেদে রক্ষাকবচ সৃষ্টি করেছিলেন। সম্ভাব্য আক্রমণ হতে এ সমস্ত আইনকে রক্ষা করবার ইহাই সাংবিধানিক পদ্ধতি। এরূপ রক্ষাকবচ না থাকলে প্রাক–সাংবিধানিক কিছু কিছু আইন সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদের বিপদ সীমায় এসে পৌঁছিতে পারে। ৪৭ (২) অনুচ্ছেদ এ সমস্ত আইনকে তা রক্ষা করেছে। এই অনুচ্ছেদ সে সমস্ত কাজকেও রক্ষা করেছে যাহা "অনুরূপ কোন আইনে" করা হয়েছে। কিন্তু তথ্যের ভিত্তিতে যদি বুঝতে পারা যায় যে, যা করা হয়েছে "তা আইনের কর্তৃত্বে" করা হয় নি, তাহলে উহা রক্ষিত হবে না। এ রক্ষাকবচের প্রয়োজন ছিল। দেশে সামাজিক উন্নয়নের জন্য পূর্ণ সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ রক্ষাকবচ জরুরী।

অনুচ্ছেদঃ ৪৭–ক

(১) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন

www.pathagar.com

প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবেনা।

ভাষ্য

এই অনুচ্ছেদ সংবিধান (প্রথম সংশোধন) আইন ১৯৭৩ দ্বারা ১৯৭৩ সালের ১৪ই জুলাই তারিখে সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে এবং ইহা অবিলম্বে বলবৎ হয়েছে। ৪৭(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, গণহত্যাজনিত অপরাধ মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দন্ডদান করবার বিধান সম্বলিত আইন সংসদ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন। যে সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ সমস্ত আইন প্রযোজ্য হবে সে সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংবিধানের নিম্নবর্ণিত তিনটি অনুচ্ছেদের চারটি দফা প্রযোজ্য হবে না। এই ব্যক্তিবর্গকে অতঃপর যুদ্ধাপরাধী বলে বর্ণনা করা হবে।

৩১ অনুচ্ছেদ যুদ্ধাপরাধীদের উপর প্রযোজ্য হবে না। সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যেকোন স্থানে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার, এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতাসহ সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে। আইন যখন প্রণয়ন এবং জারি করা হয় তখন এবং তার পরবর্তীকালে উক্ত আইনের ব্যত্যয়মূলক ক্রমেই শুধু অপরাধ সংঘটিত হয়। তদুপরি প্রণীত এবং জারিকৃত আইন এমন হতে হয় যা সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস না হয়। যুদ্ধাপরাধীদের বেলায় এ অধিকার প্রাপ্তব্য নয়।

৩৫ অনুচ্ছেদের প্রথম দফা তাদের উপর প্রযোজ্য হবে না। ৩৫ অনুচ্ছেদের প্রথম দফা নিম্নরূপঃ

অপরাধের দায়-মুক্ত সংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এরূপ আইন ভঙ্গ করবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না এবং অপরাধ সংঘটনকালে বলবৎ সে আইনবলে যে দন্ড দেয়া যেতে পারে তাকে তার অধিক বা তা হতে ভিন্ন দন্ড দেয়া যাবে না।

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে কার্যকরী হয়েছে। এ আইন দ্বারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হবে। এ আইনে ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার উক্ত অপরাধের বর্ণনা বিধৃত। মানবতাবিরোধী অপরাধ, শান্তিবিরোধী অপরাধ, গণহত্যা, যুদ্ধাপ্রাধ, মানবিক নীতিবিরোধী কার্যকলাপ প্রভৃতি এ আইনে অপরাধরূপে গণ্য করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের গঠন, অভিযোগকারীদের উপর প্রযোজ্য রীতি-নীতির বিচারের কার্যক্রম, আসামীদের প্রভৃতি এ আইনে বর্ণিত হয়েছে। এই আইন যুদ্ধাপরাধীদিগকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সংবিধানের এই দফা তাদের উপর প্রযোজ্য হবে না। সংবিধানের এই দফা অনুযায়ী (৩৫ অনুচ্ছেদের প্রথম দফা) শুধু তাহা শাস্তিযোগ্য অপরাধজনক কার্য বলে পরিগণিত হতে পারে যা ঐ কার্য করবার সময় আইনের বিধান দ্বারা অপরাধ বলে চিহ্নিত ছিল। অর্থাৎ আজ আমি আইন দ্বারা যে কাজকে অপরাধ বলছি, গতকল্য তা আইন না থাকায় অপরাধ ছিল না। এ বিধান যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না। তারা যে অপরাধ করেছেন, তা আন্তর্জাতিক আইনেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে সভ্য বিশ্বে এযাবৎ পরিগণিত হয়ে এসেছে। যা মানবতাবিরোধী, দেশের আইনের কেতাবে তার বর্ণনা না থাকলেও তা সর্বকালে অপরাধ বলে

www.pathagar.com

চিহ্নিত হবার দাবী রাখে। ৪৭-ক অনুচ্ছেদ দ্বারা ৩৫ (১) অনুচ্ছেদের মৌলিক অধিকার অপ্রযোজ্য করে সংবিধানে উপরোক্ত নীতি বলবৎ করেছে।

(৩) ৩৫ অনুচ্ছেদের তৃতীয় দফা তাদের উপর প্রযোজ্য হবে না। ৩৫ অনুচ্ছেদের তৃতীয় দফা নিম্নরূপঃ

ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকারী হবেন।

যে আইন দ্বারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে, অনিবার্য কারণে না হলে তাতে প্রকাশ্য বিচারের ব্যবস্থা আছে। দ্রুত বিচারের ব্যবস্থাও সেখানে বিদ্যমান। তবে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যতিক্রম ঘটতে পারে।

ট্রাইব্যুনাল প্রকাশ্যভাবে তাদের কার্য পরিচালনা করবেন। কিন্তু আবশ্যকবোধ করলে গোপনেও তা করতে পারবেন। ট্রাইব্যুনাল যথাশীঘ্র দ্রুততার সহিত কার্য পরিচালনা করবেন, কিন্তু প্রয়োজন বোধে অন্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারবেন। সংবিধানে ৩৫ (৩) অনুচ্ছেদ তাদে কার্য সম্পর্কে এ প্রকার প্রশ্ন অতঃপর তুলতে অধিকার দেবে না।

৪৪ অনুচ্ছেদ তাদের উপর প্রযোজ্য হবে না। ৪৪ অনুচ্ছেদের প্রথম নিম্নরূপঃ

এভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করবার জন্য এ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের নিকট মামলা রুজু করবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হল। সংবিধানে দ্বিতীয়ভাগে যে সমস্ত মৌলিক অধিকারসমূহ প্রদত্ত হয়েছে তা কার্যকর করবার জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করা যায়। এই আবেদনের অধিকারও মৌলিক, এ অধিকার যুদ্ধাপরাধীদের উপর প্রযোজ্য হবে না। যুদ্ধাপরাধীগণ সুপ্রীম কোর্টে মৌলিক অধিকার বলবৎ করবার অধিকার পাবে না। অর্থ্যাৎ এ আবেদনের মৌলিক অধিকার তাদের থাকবে না।

যুদ্ধাপরাধীগণ সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করতে পারবেন না।

প্রথম দফায় আমরা দেখেছি যে, অবস্থাগত কারণে যুদ্ধাপরাধীদের উপর কতিপয় মৌলিক অধিকার প্রযোজ্য হবে না অর্থ্যাৎ সংবিধানে বর্ণিত ঐ অধিকারগুলোর ব্যত্যয়ে আইন প্রণয়ন ও জারি করবার অধিকার সংসদ রাখবেন। বর্তমান দফায় তাদেরকে সুপ্রীমকোর্টে সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের জন্য অগ্রসর হতে নিষেধ করেছে।

যে আইনে তাদের বিচার হবে, সে আইন দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধী অপরাধীদেরকে সুপ্রীম কোর্টে আপীল বিভাগে আপীল করবার অধিকার বিদ্যমান আছে। যুদ্ধাপরাধীগণ রীট আবেদন করতে পারবেন না বটে কিন্তু ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের আওতায় যে আপীলের বিধান আছে, তার অধীনে সুপ্রীম কোর্টের প্রতিকার দাবী করতে পারবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে হয় যে, যুদ্ধাপরাধীদেরকে বিচারে আনা হয় নাই।

সংবিধান বর্ণিত মৌলিক অধিকারের মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এ সমাজে শোষণ থাকবে না। এখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। মানবিক অধিকার এবং স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য হবে। এ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের যুবশক্তি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগ তাই তেমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জোর দিয়েছে যে সমাজে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ থাকবে না। যেখানে মানুষ বাঁচার অর্থ খুঁজে পাবে।

সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন এবং দেশের সমস্ত আইন সংবিধানের পরশপাথরে যাচাই করতে হয়। জনগণের অভিপ্রায় প্রতিবিম্বিত হয় বলে সংবিধান মহামূল্যবান।

www.pathagar.com